ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কালজয়ী বিপ্লব

২য় খণ্ড

মূল : আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তাজা মোতাহারী

সংকলনে: আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শিরোনামঃ ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কালজয়ী বিপ্লব

মূলঃ শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী

সংকলেনঃ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

তত্ত্বাবধানঃ মোহাম্মদ আওরায়ী কারিমী

কালচারাল কাউন্সেলর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস - ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশনাঃ কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস - ঢাকা প্রকাশকাল : দ্বিতীয় মুদ্রণ (সংযোজিত অংশসহ), ডিসেম্বরর ০৮, মহররম ১৪৩১হিঃ, পৌষ ১৪১৬ বঃ

সংখ্যা : ২০০০

Title: Imam Hossain (A.) Er Kaljoie Biplob

Writer: Ayatullah Shahid Murtaza Motahhari

Translator: Abdul Quddus Badsha

Supervisor: Mohammad Oraei Karimi

Cultural Counsellor

Embassy of the I.R.of Iran-Dhaka

Publication Date: 2nd Edition (with addition),

December 2008

Circulation: 2000

ভূমিকা

বিসিমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শহীদদের নেতা হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) বলেন, ‘‘যদি মুহাম্মাদ (সা) এর ধর্ম আমার নিহত হওয়া ছাড়া টিকে না থাকে তাহলে, এসো হে তরবারী! নাও আমাকে।’’ নিঃসন্দেহে কারবালার মর্ম বিদারী ঘটনা হলো মানব ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয়। এটা এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা, যার সামনে বিশ্বের মহান চিন্তাবিদরা থমকে দাড়াতে বাধ্য হয়েছেন, পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে স্তুতি- বন্দনায় মুখিরত হয়েছেন এই নজিরবিহীন আত্মত্যাগের। কারণ, কারবালার কালজয়ী বিপ্লবের মহানায়করা ‘‘অপমান আমাদের সয়না”- এই স্লোগান ধ্বনিত করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংখ্যায় হাতে গোনা জনাকয়েকটি হওয়া সত্ত্বেও খোদায়ী প্রেম ও শৌর্যে পূর্ণ টগবেগ অন্তর নিয়ে জিহাদ ও শাহাদাতের ময়দানে আবির্ভূত হন এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার অধঃজগতকে পেছনে ফেলে উর্দ্ধজগতে মহান আল্লাহর সনে পাড়ি জমান। তারা স্বীয় কথা ও কাজের দ্বারা জগতবাসীকে জানিয়ে দিয়ে যান যে, ‘‘যে মৃত্যু সত্যের পথে হয়, তা মধূর চেয়েও ধাময়।’’

বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের জীবনপটে যেমন, তেমনি তাদের পবি বিশ্বাসের পাদমূলে আ রার স ীবনী ধারা বাহমান। কারবালার আন্দোলন দীর্ঘ চৌদ্দশ’ বছর ধরে- গভীর বারিধারা দ্বারা তৃ া নিবারণ করে এসেছে প্রাণসমূহের। আজও অবধি মূল্যবোধ, আবেগ, অ ভূতি, বিচক্ষণতা ও অভিপ্রায়ের অযুত- অজস্র ক্ষ্ম ও স্থুল বলয় বিদ্যমান যা এই আ রার অক্ষকে ঘিরে আবর্তনশীল। প্রেমের বৃত্ত অঙ্কনের কাটা- কম্পাস স্বরূপ হলো এ আ রা।

নিঃসন্দেহে এই কালজয়ী বিপ্লবের অন্তঃস্থ মর্মকথা এবং এর চেতনা, লক্ষ্য ও শিক্ষা একটি সমৃদ্ধশালী, নিখাদ ও প্রেরণাদায়ক সংস্কৃতি গঠন করে। প্রকৃত ইসলামের বিস্তৃত অঙ্গনে এবং আহলে বাইেতর হৃদ ভক্তকুল, ছোট- বড়, জ্ঞানী- মূর্খ নির্বিশেষে সর্বদা এই আ রা সংস্কৃতির

সাথেই জীবন যাপন করেছে, বিকিশত হয়েছে এবং এ জন্যে আত্মাহুতি দিয়েছে। এই সংস্কৃতির চর্চা তাদের জীবনে এত দূর প্রসারিত হয়েছে যে জন্মক্ষণে নবজাতেকর মুখে সাইয়্যেদুশ হাদার তুরবাত (কারাবালার মাটি) ও ফোরাতের পানির আস্বাদ দেয় এবং দাফনের সময় কারবালার মাটি মৃতের সঙ্গে রাখে। আর জন্ম থেকে মৃত্যু অবিধও সারাজীবন হোসাইন ইবনে আলী (আ.) এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণ করে, ইমামের শাহাদাতের জন্য অশ্রুপাত করে। আর এই পবি মমতা দুধের সাথেই প্রাণে প্রবেশ করে আর প্রাণের সাথেই নিঃসিরত হয়ে যায়।

কারবালার আন্দোলন সম্পর্কে অদ্যাবিধ অসংখ্য রচনা, গবেষণা এবং কাব্য রচিত হয়েছে। ক্ষ্ণ চিন্তা ও ক্ষুরধার কলমের অধিকারী যারা, তারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও নানান দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই কালজয়ী বিপ্লবের বিশ্লেষণ করেছেন। এই সকল রচনাকর্ম যদি এক করা হয় তাহলে তা পরিণত হবে এক মহাগ্রন্থাগারে। কিন্তু তবুও এ সম্পর্কে নব নব গবেষণা ও ভাবনার অঙ্গন এখনো উন্মুক্ত রয়ে গেছে। কবি 'সায়েব' এর ভাষায়ঃ

''এক জীবন ধরে করা যায় (ধু) বন্ধুর কোকড়া চুলের বর্ণনা
এই চিন্তায় যেওনা যে ছন্দ ও স্তবক ঠিক থাকলো কি- না''

বক্ষমান বইখানি মহান দার্শনিক ও রুহানী আলেম আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তাজা মোতাহারীর এই কালজয়ী বিপ্লব সম্পর্কিত বক্তৃতামালা ও রচনাবলী থেকে নির্বাচিত অংশের বঙ্গা বাদ। ফার্সী ভাষায় 'হেমাসা- এ হোসাইনী' শিরোনামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই থেকে আরো ৬টি কলাম যোগ করে বাংলাভাষায় বর্ধিত কলেবরে দ্বিতীয় বারের মতো প্রকাশিত হলো ''ইমাম হোসাইন (আ.) এর কালজয়ী বিপ্লব''। ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক বইটি প্রকাশ করে বাংলাদেশের আহলে বাইত (আ.) এর প্রতি ভালবাসা পোষণকারী সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হল যাতে তাদের আল্লাহ অভিমুখে পূর্ণযা ার পথে আলোকবর্তিকা হয় ইনশাআল্লাহ।

আশা করা যায়, বইটি পবি আহলে বাইত (আ.) এর ভক্তকূল, যারা অন্তরে ইমাম হোসাইন (আ.) এর প্রেমভক্তি লালন করে এবং তারই সমুন্নত আদর্শের সামনে মাথা নোয়ায়, তাদের জন্য উপকারী হবে।

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাস, ঢাকা।

হোসাইনী আন্দোলন মহান ও বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন

বীরত্বপূর্ণ কথা হল সেই কথা যা দিয়ে মা ষের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বিপুল অ প্রেরণা ও অদম্য শক্তি যোগানো যায়। আর প্রকৃত বীরপুরুষ হলেন সেই ব্যাক্তি যার মধ্যে অন্যায় রোধের এ মানসিকতা জোয়ারের মতো উথলে পড়ে। যার মধ্যে মহত্ত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, দৃঢ়তা, সততা, সত্যতা, অধিকার রক্ষায় কঠোরতা, সৎ- সাহস এবং মুক্তবুদ্ধি রয়েছে তিনিই হলেন আসল বীরপুরুষ।

কারবালা ঘটনার একপিঠে রয়েছে পাশিবক নৃশংসতা ও নরপিশাচের কাহিনী এবং এ কাহিনীর নায়ক ছিল ইয়াযিদ, ইবনে সা'দ, ইবনে যিয়াদ এবং শিমাররা। আর অপর পিঠে ছিল একত্ববাদ, দৃঢ় ঈমান, মানবতা, সাহসিকতা, সহা ভূতি ও সহমর্মিতা এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় আত্মদানের কাহিনী এবং এ কাহিনীর নায়ক আর ইয়াযিদরা নয়, বরং এ পিঠের নায়ক হলেন শহীদ সম্রাট ইমাম হোসাইন (আ.), তার ভগ্নি হযরত যয়নাব এবং তার ভাই হযরত আব্বাসরা, যাদেরকে নিয়ে বিশ্বমানবতা গৌরব করতে পারে। তাই কারবালা ঘটনার সমস্তটাই ট্রাজেডি বা বিষাদময় নয়। অবশ্য পৃথিবীতে বহু ঘটনাই ঘটেছে যেগুলোর কেবল একপিঠ রয়েছে অর্থাৎ এসব ঘটনা কেবলমা দুঃখজনক ও শোকাবহ।

উদাহরণস্বরূপ, বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সভ্যতার লালন ভূমি ইউরোপরে এক দেশ ''বসিনয়ার'' কথাই ধরা যাক- কেবল মুসলমানের গন্ধটুকু তাদের গায়ে থাকায় তাদের উপর চালানো হলো নির্মম গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, ঘর- বাড়ী ধ্বংস.... ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের অপরাধ ধু এটুকু যে, তারা ছিল মুসলমান। আর এ জন্যেই এটি দুঃখজনক যে, বিশ্বে আজ এতগুলো নিরাপত্তা সংস্থা রয়েছে যারা কুকুরের উপরে অত্যাচার করাকেও নিন্দা করে, রয়েছে মানবাধিকার সংস্থা জাতিসংঘ। অথচ এদের কোনটাকেই তোয়াক্কা না করে এক নিরস্ত্র- নিরীহ জাতিকে ধ্বংস করার পায়তারা চললো। কেউ তাদেরকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো না। তাই এ ঘটনা সত্যিই

দুঃখজনক। কিন্তু এ ঘটনার এই একটিমা ই পিঠ আছে যা কেবল নৃশংসতা ও পাশবিকতায় ভরা।

কিন্তু কারবালাকে এভাবে বিচার করলে অবশ্যই ভুল হবে। এ ঘটনার একটি কালো অধ্যায় ছিল সত্য, কিন্তু আরেকটি উজ্জ্বল অধ্যায়ও আছে। ধু তাই নয়, এর উজ্জ্বল অধ্যায় কালো অধ্যায়ের চেয়ে শত- সহস্র গুণে ব্যাপক ও শ্রেষ্ঠ । শহীদ সম্রাট ইমাম হোসাইন (আ.) আ রার রাতে তার সঙ্গী- সাথীদেরকে প্রশংসা করে বলেনঃ

فانّى لا اعلم اصحابا اوفى و لاخيرا من اصحابى

''আমি পৃথিবীতে তোমাদের চেয়ে বিশ্বস্ত ও উত্তম কোনো সহযোগীর সন্ধান পাইনি।'' (দ্রঃ তারিখে তাবারীঃ ৬/২৩৮- ৯, তারিখে কামেলঃ ৪/২৪, বিহারুল আনোয়ারঃ ৪৪তম খণ্ড, কিতাবুল ইরশাদঃ ২৩১, এ'লামুল অরাঃ ২৩৪, মাকতালু মোকাররামঃ ২৫৮, মাকতালু খারাযমীঃ ২৪)

তিনি কিন্তু বললেন না : আগামীকাল তোমাদেরকে নিরাপরাধভাবে হত্যা করা হবে। বরং তিনি এমন এক সনদপ পেশ করলেন যার মাধ্যমে তার সহযোগীরা বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা.) সহযোগীদের চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন হলেন, তার পিতা হযরত আলী (আ.)- এর সহযোগীদের চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন হলেন। আম্বিয়াদের যারা সাহায্য করেছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে পবি কুরআনে বলা হচ্ছেঃ

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

''কত নবী যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি ও নতি স্বীকার করেনি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে পছন্দ করেন।'' (আল ইমরানঃ ১৪৬)

অথচ ইমাম হোসাইন (আ.) প্রকারান্তরে তার সহযোগীদেরকে আম্বিয়াকেরামের এ সকল সহযোগীদের চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

তরাং আমরা যখন স্বীকার করলাম যে, কারবালার ঘটনায় দু'টি পিঠ ছিল তখন গৌরবের এ পিঠ নিয়েও আমরা এক গবেষণা করে দেখতে চাই। পাশাপাশি এটিও আমাদের মেনে নিতে হবে যে, এতকাল ধরে আমরা কেবল কারবালার অন্ধকার ও কলুষতার দিকটা নিয়ে মাতামাতি করে বড় ভুল করেছি। কেননা, এতে করে আমরা মনের অজান্তেই ইয়াযিদদেরকে জয়ের মালা পরিয়েছি এবং তাদেরকেই নায়ক বানিয়েছি।

কেউ যদি ইমাম হোসাইনের (আ.) মর্মান্তিক শাহাদাত উপলক্ষে শোক মিছিল করে, অথচ অমা ষ ইয়াযিদের নামের পাশে সম্মানসূচক নানান শব্দও ব্যাবহার করে থাকে- তাহলে সে কারবালা থেকে কোন শিক্ষাই নিতে পারলো না। মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা করা মা ষের এক সহজাত প্রবৃত্তি । অভ্যাসকে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা একান্তই বোকামি। কিন্তু মহাপুরুকে যেমন সম্মানভরে স্মরণ করা হয় তেমনি কাপুরুষকেও অবশ্যই ঘৃণা করা উচিত। কেননা, মহাপুরুষ ও কাপুরুষ উভয়কেই যদি আমরা শ্রদ্ধা করলাম- তাহলে হক আর বাতিলের মধ্যে আর কি- ই বা তফাৎ থাকলো? কাজেই, যে কেবল ইমাম হোসাইনের (আ.) মজলুমতাকে নিয়েই মূর্ছিত হবে সে যেমন ভুল করবে ঠিক তেমনিভাবে যে ইয়াজিদকে নায়ক বানিয়ে তার নামের পাশে সম্মানার্থক বিভিন্ন উপাধি ব্যাবহার করবে সেও একজন কাপুরুষকেই স্বীকৃতি দিল। যদিও আমরা সবাই ইমাম হোসাইনকে (আ.) শ্রদ্ধা করি।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের ভাগ্য নিজের হাতেই গড়ার স্বার্থে হোসাইনী আন্দোলনের যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে আজ সেভাবেই এগিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হয়ে উেঠেছ। খের ব্যাপার হল যে, মুসলমানরা ইদানীং এ ব্যাপারে যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

যারা বীর তাঁদের আত্মা সাহসী। তারা তাদের এ সাহসকে নিজের দেশ ও জাতির স্বার্থে প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু যে বীর তার সাহসকে এমন কি মানবতার স্বার্থকে পেরিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকুলের কল্যাণে প্রয়োগ করে- তিনি অবশ্যই আদর্শ ও অ করণীয়। কেননা তিনি সমস্ত শক্তি ও সাহসকে

একমা মহান অধিকর্তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই কাজে লাগিয়েছেন। আর এ কারণেই এ বীরত্ব মহান ও পবি ও বটে।

ভীরু কোনিদন বীর হতে পারে না। নাদির শাহ, বখিতয়ার খিলজী, নেপোলিয়ান- এরা সবাই সাহসী। সাহস ছিল বলেই এরা দেশজয় করতে পেরেছিল। এদের সবারই দৃঢ় মনোবল ও দুর্দম সাহস ছিল। এরা বীরও ছিল বটে। কিন্তু তাদের এ সাহস- তাদের এ বীরত্ব পবি ও মহৎ নয়। এদের সবাই হুকুমতের লোভে, পদের লোভে ও স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই সাহস দেখিয়েছে। এরা অন্য জাতির রক্ত নিংড়িয়ে নিজের নাম ইতিহাসে অমর করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। স্বদেশের কাছে সে হয়তো একজন মহাবীর, কিন্তু পরাজিত জাতির কাছে সে চরম শত্রু। নেপোলিয়ান ফরাসিদের চোখে হয়তো একজন মহান বীর, কিন্তু রুশ কিংবা ইংরেজদের কাছেও কি সে মহাবীরের সম্মান পাবে? - কখনই না। কারণ, সে রুশ ও ইংরেজদের মান-ইজ্জত পদদলিত করে ফ্রান্সের মর্যাদা বাড়াতে চেয়েছিল। এসব ব্যক্তি সাহসী বীর ছিলেন। কিন্তু তাদের বীরত্ব আত্মসিদ্ধির বীরত্ব । নিজের স্বার্থ পুরণের বীরত্ব । একজন বড় সাম্রাজ্যবাদীর বীরত্ব । কিন্তু এ বীরত্ব তো কখনো মহৎ হতে পারে না। মহৎ ও পবি বীরত্বের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন রকম। সে সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, নেপোলিয়ান, ইস্কান্দার এরা মহান বীর ছিল না। মহান বীর হলো সেই ব্যক্তি যিনি নিজের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ, এমন কি নিজের মহাদেশেরস্বার্থের জন্যেও বাহাদুরি দেখায় না। তার লক্ষ্য এসব দেশ- জাতির সীমানার উর্ধ্বে । সে কেবল হাকীকত ও সত্যকেই দেখে। সংক্ষেপে বলতে গেল বলতে হয় যে, সে সমস্ত ম ষ্যত্বও মানবতার জন্যে নিজের সাহস প্রয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ কোরআনের এই আয়াতটি উল্লেখ্য :

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ)

‘‘বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা না করি, কোনো কিছুকেই তার শরীক না করি এবং আল্লাহ ব্যাতীত আমাদের কাউকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ না করি।’’ (আল ইমরানঃ ৬৪)

অর্থাৎ তোমরা যারা আহলে কিতাব বলে দাবী করো! এসো আমরা সবাই এক রে কথা বলি; এক আকীদার স্বার্থে আমরা নিজেদেরকে বিলীন করে দেই, আমরা সবাই জোর কন্ঠে ঘোষণা করিঃ

الا نعبد الا الله

‘আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব মানি না।’

و لا يتّخذ بعضا بعضا اربابا من دون الله

এসো শোষণ- নিপীড়নের অবসান ঘটাই, মানব পূজা বন্ধ করি, সমাজে ন্যায়- নীতি এবং সমতা ও সাম স্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করি। কোরআন বলেনি যে, এসো আমার ও তোমার জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে অপর এক জাতিকে শোষণ করি। এ ধরনের কোনো কথাই কোরআনে পাওয়া যাবে না। তাই কোনো আন্দোলন- কোনো বীরত্ব তখনই মহান ও পবি হবে যখন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও পবি ও মহান হবে, তা সমস্ত মানবতার পথে পরিচালিত হবে যেমনভাবে সূর্য তার আলো দিয়ে সমস্ত জাতি ও সব মা ষকেই উপকার প্রদান করে।

দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য কোনো আন্দোলন ও বিদ্রোহকে মহান করে তা হলো এমন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে এ আন্দোলন অ ষ্ঠিত হবে যখন কোনো মা ষ এর ধারণাও করতে পারে না। ঘন অন্ধকারের মধ্যে এক খণ্ড আলোর ঝলকানি, ব্যাপক জুলুম- স্বৈরাচারের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার বজ্র আওয়াজ, চরম স্থবিরতার মধ্যে প্রকাণ্ড ধাক্কায় নিস্তব্ধ নিশ্চুপের মধ্যে হঠাৎ গর্জে ওঠা। উদাহরণস্বরূপ নমরুদের মতো একজন অত্যাচারী শোষক পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু আজীবন এ পিরিস্থিতি অব্যাহত থাকেনি। হঠাৎ করে একজন ইবরাহীমের (আ.) আবির্ভাব ঘটে ও নমরুদের কাল হয়ে দাঁড়ায়।

(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا)

‘‘ইবরাহীম একাই এক অ গত জাতি ছিলেন।’’ (নাহলঃ ১২০) তেমনি ফেরাউনের মতো একজন নির্দয় ও অহংকারীও রক্ষা পায়নি। কোরাআন ভাষায় :

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ)

‘‘ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদেরকে সে হীনবল করেছিল। তাদের পু দেরকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে সে জীবিত রাখত।’’ (কাসাস- ৪)

কিন্তু এই পরাক্রমশালী ফেরাউনও টেকেনি। হঠাৎ করে একজন মূসা (আ) তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন।

তারপর আরব যখন শোষণ- নিপীড়ন, মূর্তিপূজা, কন্যাসন্তানকে জীবিত হত্যা, রক্তপাত, দ্বন্দ- কলহ, ব্যভিচারে এবং অন্ধকারে ছেয়ে গেল তখন একজন মুহাম্মদের (সা.) আবির্ভাব হয় যিনি ফরিয়াদ করে বলতে থাকেনঃ

(قولوا لا اله الله تفلحون)

‘‘বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তবেই তোমরা খী হতে পার।”

আর আজ স্বৈরাচারী উমাইয়া সরকার স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সকল সাজ- সর ামে সজ্জিত হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। এমন কি ধর্মকে ভাঙ্গিয়েও সৈরতন্ত্রের ভিত গাড়তে উদ্যত হয়েছে, দুনিয়ালোভী হাদীস বর্ণনাকারীদেরকে টাকা দিয়ে কিনে তাদের সপক্ষে হাদীস জাল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়, একজন দরবারী আলেম বলেছিলঃ

انّ الحسين قتل بسيف جدّه

‘‘ইমাম হোসাইন (আ.) তার নানার তেলোয়ারের আঘাতেই নিহত হয়েছেন।’’ একথার মাধ্যমে সে বলতে চেয়েছিল যে, ইমাম হোসাইনের (আ.) নানার ধর্মমতেই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু আমি (ওস্তাদ মোতাহারী) বলবো যে, এক অর্থে একথা ঠিকই। কেননা, বনি উমাইয়া ইসলামকে এমনভাবে তাদের শোষণ ও স্বৈরাচারের সেবায় নিয়োগ করতে পেরেছিল যে, একদল

দুনিয়ালোভী ও নামমা মুসলমানকে ইসলামী জিহাদের নামে ইমাম হোসাইনের (আ.) বিরুদ্ধে লিপ্ত করতে সক্ষম হয়।

و كل يتقرّبون الى الله بدمه

‘‘তারা ইমাম হোসাইনের (আ.) বুকের রক্ত ঝরিয়ে আল্লাহর নৈকট্য পেতে চায়।’’ তারা ইমাম হোসাইনকে (আ.) হত্যা করতে পারার জন্যে শোকর আদায়স্বরূপ একাধিক মসিজদ নির্মাণ করে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, মা ষকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল।

এ রকম এক বিপর্যয়ের মুহূর্তে ইমাম হোসাইন (আ.) মুক্তির মশাল জ্বালিয়ে এগিয়ে এলেন। যখন মা ষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছিল, মা ষের মতামত প্রকাশের কোনো সাহস ছিল না। কোনো সত্যি কথা বলাও যখন কারও সাহসে কুলাতোনা, এমন কি এর কোনো প্রতিরোধ অবাস্তবে পরিণত হয়- ঠিক সে মুহূর্তে ইমাম হোসাইন (আ.) বীরদর্পে বিরোধিতায় নামলেন, বজ্রকন্ঠে সত্যবাণীর স্লোগান তুলে দুনিয়া কাপিয়ে দিলেন। খোদাদ্রোহী স্বৈরাচারের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিলেন। আর এ কারণেই তার আন্দোলন মহিমা লাভ করেছে। তার আন্দোলন কালের গন্ডী ছাড়িয়ে যুগ- যুগান্তরের মুক্তি কামী ও সত্যান্বেষী মা ষের জন্যে অ করণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছে।

তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি হোসাইনী আন্দোলনকে মহতী ও পবি করেছে তা হলো ইমাম হোসাইনের (আ.) দুরদর্শিতা ও উন্নত চিন্তাধারা। অর্থাৎ এ আন্দোলন এ কারণেই মহান যে, আন্দোলনকারী যা বুঝতে ও দেখতে পারেছন তা অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না। ঐ প্রবাদ বাক্যেটির মতো বলতে হয় যে, অন্যরা আয়নায় যা দেখতে পাচ্ছে না তিনি খড়কুটোর মধ্যেই তা দেখছেন। তিনি তার একাজের দূর প্রসারী ভাব দেখতে পাচ্ছেন। তার চিন্তাধারা সমসাময়িক যেকানো চিন্তাশীল লোকের উর্ধ্বে । ইবনে আব্বাস, ইবনে হানাফিয়া, ইবনে উমর প্রমুখ হয়তো পুরোপুরি নিষ্ঠার সাথে ইমামকে (আ.) কারবালায় যেতে নিষেধ করিছিলেন। তাদের চিন্তার মান অ যায়ী ইমামকে বাধা দেয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হোসাইন (আ.) যা দেখেছিলেন তারা তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। তারা অত্যাসন্ন বিপদকেও যেমন অ ভব করছিলেন না তেমনি এ ধরনের আন্দোলন ও বিদ্রোহের

দুরপ্রসারী ভাবকেও অ ধাবন করতে পারছিলেন না। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) সবকিছুই দিনের আলোর মতো দেখছিলেন। তিনি একাধিকবার বলেছেনঃ ওরা আমাকে হত্যা করবেই; আর আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমার হত্যার পর ওদের অবস্থা বিপন্ন হবে। এ ছিল ইমাম হোসাইনের (আ.) তীক্ষ্ণ দুরদর্শিতা।

ইমাম হোসাইন (আ.) এক মহান ও পবি আত্মার নাম। মূলত যখন কোন আত্মা মহান হয় তখন বেশী কষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু ছোট আত্মা অধিক নির্ঝ াটে থাকে। এ এক সার্বিক নিয়ম। ইবনে আব্বাসরা যদি ইমাম হোসাইনকে (আ.) বাধাও দেয় তবুও কি তিনি বিরত হতে পারেন! আরবের খ্যাতনামা কবি 'মোতানাববী' এ প্রসঙ্গে ন্দর একটি উক্তি করেছেন, তিনি বলেন :

تبعـــــت فـــــى مرادهـــــا الاجســـــام و اذا كانـــــت النفـــــوس كبـــــارا

''যখন কোনো আত্মা মহান হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে অন্যদের পরি াণে ছোটে, অন্যদের জন্যে কষ্ট ও যন্ত্রণা বরণ করে নেয়। কিন্তু যার আত্মা ছোট সে কেবল নিজের খ- স্বাচ্ছন্দ নিয়েই।'' (দিওয়ানে মোতানাববীঃ ২/২৬৭) ছোট আত্মা একটু ভাল খাবারের জন্যে চাটুকারও হতে রাজি। ছোট আত্মা ক্ষমতা বা খ্যাতির লোভে হত্যা- লুন্ঠনও করতে রাজি। কিন্তু যার রয়েছে মহান আত্মা, সে কনো রুটি খেয়ে তৃপ্ত হয়, তারপর ঐ সামান্য আহার শেষে সারারাত জেগে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হয়। নিজের দায়িত্ব পালনে বিন্দুমা গাফলতি করলে ভয়ে তার শরীর কাপতে থাকে। যার আত্মা মহান সে আল্লাহর পথে ও স্বীয় মহান লক্ষ্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে চায়। আর এ পথে যখন সফলকাম হয় তখন আল্লাহকে শোকর করে। আত্মা মহান হলে আ রার দিনে, এক শরীরে তিনশ' ক্ষত সহ্য করতে হয়। যে শরীর ঘোড়ার পায়ে পয়মল হয় সে একটি মহান আত্মার জরিমানা দেয়, একটি বীর, সত্য পূজারী এবং শহীদের আত্মার জরিমানা দেয়।

এই মহান আত্মা বলে ওঠে আমি আমার রক্তে মূল্য দিতে চাই। শহীদ কাকে বলে? প্রতিদিন কত মা ষ নিহত হচ্ছে । কিন্তু তাদেরকে কেন শহীদ বলা হয় না? শহীদ শব্দটি ঘিরে কেন এক পবি তার আবেশ পাওয়া যায়? কারণ শহীদ সেই ব্যক্তি যার এক মহান আত্মা আছে সে আত্মা

এক মহান লক্ষ্যকে অ সরণ করে। শহীদ সে ব্যক্তি যে স্বীয় ঈমান ও আকীদা রক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, যে নিজের জন্যে তো নয়ই বরং ম ষ্যত্ব ও মানবতার স্বার্থে, সত্য ও হাকিকতের স্বার্থে চরমদুঃখ- দুর্দশা এমন কি মৃত্যুকেও সাদরে বরণ করে নেয়। শহীদ তার বুকের রক্ত দিতে চায় যেমনভাবে একজন ধনী তার ধনকে ব্যাংক বন্দী না করে তা সৎপথে দান- খয়রাত করে স্বীয় ধনের মূল্য দিতে চায়। সৎপথে ব্যয়িত প্রতিটি পয়সা যেমন লক্ষ - কোটি পয়সার মতো মূল্য লাভ করে তেমনি শহীদের প্রতি ফোটা রক্ত লক্ষ- কোটি ফোটায় পরিণত হয়। অনেকে হয়তো স্বীয় চিন্তাশক্তির মূল্য দেয় ও একটি আদর্শিক গ্রন্থ মানবকে উপহার দেয়। কেউ কেউ নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে একটি উপকারী শিল্প মা ষকে উপহার দেয়। কিন্তু শহীদরা তাদের রক্ত দিয়ে মানবের শান্তি ও কল্যাণের পথকে মসৃণ ও নিশ্চিত করে।

এখন প্রশ্ন হলো: এদের মধ্যে কে মানবতাকে সবচেয়ে বেশী সেবা করলো ?

অনেকে হয়তো ধারণা করতে পারে যে, একজন লেখক বা একজন ধনী কিংবা একজন শিল্পীর সেবাই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু আসলে এ ধারণা একবারেই ভুল। শহীদদের মতো কেউই মা ষকে তথা মানবতাকে সেবা করতে পারে না। শহীদরাই সমস্ত কন্টকময় পথ পেরিয়ে মানবতার মুক্তি ও স্বাধীনতাকে বয়ে নিয়ে আসে। তারাই ন্যায়- নীতিবান ও শান্ত সমাজ গড়ে দিয়ে যায় যাতে জ্ঞানীর জ্ঞান, লেখেকর কলম, ধনীর ধন, শিল্পীর শিল্প স্থ পরিবেশে বিনা বাধায় বিকাশ লাভ করতে পারে এবং মানবতা নিশ্চিন্তে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। শহীদরাই প্রদীপের মতো একটি পরিবেশকে আলোকিত করে রাখে যাতে সবাই অনায়াসে পথ চলতে পারে।

পবি কোরআন রাসূলুল্লাহ (সা.)- কে একটি প্রদীপের সাথে তুলনা করেছে। জগতে অবশ্যই প্রদীপ থাকতে হবে। অন্ধকার জগত নীরব- বধির, জীবনযা া সেখানে অচল। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত কবি পারভীন এ'তেসামী ন্দর একটি উপমার অবতারণা করেছেন। তিনি একজন দক্ষ শিল্পী ও একটি প্রদীপের কথোপকথনকে এভাবে চি ত করেছেন-

شـــاهدي گفـــت بـــه شمعـــی کامشـــب   دور دیـــــــوار مـــــــزین کـــــــردم

دیشـــــب از شـــــوق نخفـــــتم یکـــــدم   دوخـــــتم جامـــــه و بـــــرتن کـــــردم

کـــس ندانســـت چـــه ســـحر آمیـــزی   بـــه پرنـــد از نـــخ و ســـوزن کـــردم

تـــــــوبگرد هنـــــــرمن نرســـــــی   زانکـــه مـــن بـــذل ســـر وتـــن کـــردم

শিল্পী প্রদীপকে বলেঃ 'তুমি জান না, আমি গত রাতে এক মুহূর্তেও ঘুমাইনি। সারা রাত জেগে কত ন্দর ন্দর ফুল তুলেছি। আমার জামাটিকে ফুলবাগিচা বানিয়েছি। তুমি কখনোই আমার মতো ফুল তুলতে পারবে না। আমি আমার শরীরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে অসামান্য দক্ষতা খরচ করেছি।'

শিল্পীর একথা নে প্রদীপ একটু মুচকি হেসে বললোঃ

شمـــع خندیـــد کـــه بـــس تـــیره شـــدم   تـــــا ز تاریکیـــــت ایمـــــن کـــــردم
پـــــی پیونـــــدگهرهای تـــــو بـــــس   گهـــــر اشـــــک بـــــدامن کـــــردم
تـــــــوبگرد هنـــــــرمن نرســـــــی   حاصـــل شـــوق تـــو خـــرمن کـــردم

তুমি যে দাবী করছো সারা রাত জেগে তোমার রুচি ও দক্ষতাকে ফুটিয়ে তুলেছো- এসবই ছিল আমার আত্ম - নিঃশেষ করার ফল। আমি তিলে তিলে ক্ষয় হয়েছি ও তোমাকে আলো দিয়েছি বলেই তো তুমি তোমার দক্ষতাকে চ ও তোয় আকতে পেরেছো। তোমার এসব দক্ষতা আমার জীবনের বিনিময়েই সম্ভব হয়েছে। তারপর বলছে:

کارهـــــایی کـــــه شمـــــردی بـــــرمن   تـــو نکـــردی همـــه را مـــن کـــردم

'তাই তুমি সারা রাত ধরে যা করেছ বলে দাবী করছো- এসবই আমি করেছি।'

আজকে ইবনে সিনা- ইবনে সিনা হতো না, শেখ সাদী- শেখ সাদী হতো না, জাকারিয়া রাজী- জাকারিয়া রাজী হতে পারতো না যদি শহীদরা তাজা রক্ত খরচ করে ইসলামের চারাগাছকে

সজীব না করতেন, ইসলামী সভ্যতাকে বাঁচিয়ে না রাখতেন। তাদের সমস্ত অস্তিত্বে একত্ববাদ, খোদাভীতি, ন্যায়পরায়ণতা, সৎসাহস আর বীরত্বে ভরপুর। তাই আমরা আজ যারা মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি তারা সবাই এ শহীদদের প্রতি ঋণী। ইমাম হোসাইনের (আ.) রক্তের প্রতি নবীজীর (সা.) উম্মত ঋণী।

মনস্তত্ত্ববিদরা বিশেষ করে যারা মহামানবের জীবন চরি লেখেন তারা বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিকতা উদ্ধারের জন্যে এক চাবির খোজ করেন। তারা বলেন, প্রতিটি ব্যক্তিত্বের একটি নির্দিষ্ট চাবি রয়েছে, যদি ঐ চাবিটি খুজে পাওয়া যায় তাহলে ঐ ব্যক্তির জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য এ কাজ খুব সহজ নয়। বিশেষ করে যারা বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মিশেরর খ্যাতনামা চিন্তাবিদ আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ ‘‘আবকারিয়াতুল ইমাম’’ নামে একটি বই রচনা করেছেন। সেখানে তিনি মত ব্যক্ত করেন যে, আমি হযরত আলীর (আ.) ব্যক্তিত্বের চাবি খুজে পেয়েছি। হযরত আলী (আ.) এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি যুদ্ধের ময়দানে, সাংসারিক জীবনে, ইবাদতের মেহরাবে, শাসনামলে সবক্ষে ই এবং জীবনের প্রতিটি পদেই তিনি পৌরুষত্বের অধিকারী ছিলেন। পৌরুষত্ব সাহসিকতার অনেক উর্ধ্বে । মহাকবি রুমী ৭০০ বছর আগেই ঘোষণা করে গেছেন যে, হযরত আলীর (আ.) ব্যক্তিত্বে সাহসিকতার উর্ধ্বে কিছু ছিল।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত আলী (আ.) যখন আরবের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা উমার ইবনে আব্দুদকে ধরাশায়ী করে তার শিরচ্ছেদ করার জন্যে তার বুকে চেপে বসলেন তখন উমার ইবনে আব্দুদ রাগের চোটে হযরত আলীর (আ.) মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো। হযরত আলী (আ.) উঠে দাঁড়ালেন এবং দু’তিন পদক্ষেপে হেটে হেটে যখন শান্ত হলেন তখন পুনরায় তার বুকে চেপে বসলেন। উমার ইবনে আব্দুদ হযরত আলীর (আ.) আচরেণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো : আগের বার আমার গলা কাটতে এসে উঠে গেলে কেন? হযরত আলী (আ.) বললেন, তুমি যখন আমার মুখে থুথু দিলে তখন আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম এবং এ রাগ ছিল আমার ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে। তাই আমি যদি তখন তোমাকে শিরচ্ছেদ করতাম তাহলে তাতে আমার ব্যক্তিগত ক্রোধেরও অংশ থাকতো। কিন্তু আমি চাই আল্লাহর শত্রুকে একমা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই হত্যা করতে। নিজের

ক্রোধবশত হত্যা করার কোনো খাহেশ আমার নেই। মাওলানা রুমী এ ঘটনাকে খুব চমৎকারভাবে কবিতার লাইনে বেধেছেন। তিনি বলেনঃ

در شـــــــجاعت شـــــــیر ربانیســـــــتی   در مـــروت خـــود کـــه دانـــد کیســـتی

‘সাহসিকতায় তুমি আল্লাহর সিংহস্বরূপ কিন্তু পৌরুষত্ব ও বীরত্বের দিক থেকে তুমি কে তা কেউ বর্ণনা করতে অক্ষম। পৌরুষত্ব ও বীরত্বে তুমি অতুলনীয় এবং তা প্রকাশ করার জন্যে উপযুক্ত কোনো ভাষা নেই।’ (ফি রেহাবে আয়েম্মেয়ে আহলে বাইত :৩/৯৭, মানাকিবে ইবনে শহরে অ বঃ ৪/৬৯, মাকতালু মোকাররমঃ ২১৮, বিহারুল আনোয়ারঃ ৪৫/২৩৮, ইরশাদে মুফিদঃ ২২৫, এলোমুল ওরাঃ ২৩০) ঐ মিশরীয় চিন্তাবিদও হযরত আলীর (আ.) এই পৌরুষত্বের দিকেই ইশারা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি হযরত আলীর (আ.) কিংবা হযরত ইমাম হোসাইনের (আ.) মত মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্বের চাবি উদ্ধার করতে পেরেছে বলে দাবী করে তাহলে তাদের এ দাবী অতিরি ত বৈ কিছু কিছুই নয়। গবেষণার পর ধু যেটুকু বলা যায় তাহলো যে ইমাম হোসাইনের (আ.) ব্যক্তিত্বের চাবি পৌরুষত্ব, বীরত্ব, বিচক্ষণতা, মহত্ত্ব, দৃঢ়তা, অটলতা এবং সত্য পূজারীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

ইমাম হোসাইনের (আ.) বাণী কমই আমাদের কাছে পৌছেছে। তবে যেটুকু আছে তা থেকেই তার এ মহান মানসিকতার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। ইমাম হোসাইন (আ.)- এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি যেসব কথা নিজ কানে রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছ থেকে নেছেন তার থেকে দু’একটি আমাদেরকে বলুন। তখন ইমাম হোসাইন (আ.) রাসূলুল্লাহর (সা.) শত- সহস্র বাণীর মধ্যে কোন বাণীটি নির্বাচন করলেন তা থেকেই সহজে ইমাম হোসাইনের (আ.) ব্যক্তিত্বের ধরন অ ধাবন করা যায়। ইমাম হোসাইন (আ.) বললেন, আমি নিজ কানে রাসূলুল্লাহর (সা.) মুখ থেকে যা নেছি তা হলোঃ

اِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَعَالِى الْاُمُورِ وَاَشْرَافَهَا وَ يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

‘‘আল্লাহ বড় এবং মহান কাজকে পছন্দ করেন এবং নীচ কাজকে তিনি ঘৃণা করেন।’’ (জামেউস সাগীর ১/৭৫)

ইমাম হোসাইনের (আ.) মর্যাদা এবং মহত্ত্ব কোথায়! রাসূলুল্লাহর (সা.) বাণী থেকে কোনটি নির্বাচন করে নিলেন ? মূলত তিনি নিজেকেই তুলে ধরেছেন।

ইমাম হোসাইনের (আ.) প্রতিটি কথায় ম ষ্যত্ব ও মানবতার ইজ্জত সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে। -

مَوْتُ فِى عِزٍّ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِى ذُلٍّ

অর্থাৎ, ‘‘সম্মানের মৃত্যু অপমানের জীবনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।’’

অন্য এক বাণীতে তিনি বলেন :

اِنَّ جَمِيعَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا بَحْرِهَا وَ بَرِّهَا وَ سَهْلِهَا وَجَبَلِهَا عِنْدَ وَلِيٍّ مِنْ اَوْلِيَاءِ اللهِ وَاَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَقِّ اللهِ اَفْيَئِ الظِّلَالِ.

‘যা কিছুর উপর সূর্য আলো দান করে- সারা দুনিয়া এবং তার বাসিন্দারা, সাগর- মাটি, পাহাড়- পর্বত- মরুভূমি এসব কিছুই একজন খোদাভক্ত এবং খোদা- পরিচিত ব্যক্তির কাছে একটি ছায়ার চেয়ে মূল্যবান কিছু নয়। এরপর তিনি বলেন :

اَلَا حُرٌّ يَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ لِاَهْلِهَا

‘এমন কাউকে কি পাওয়া যাবে না যে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে তার প্রতি অনাসক্ত থাকবে?’ (লুমআতু মেন বালাগাতিল হোসাইন নাফা ল মাহমুম)

যারা দুনিয়া নিয়ে মত্ত এং দুনিয়ার দাসত্ব করে তারা আসলে জানে না যে, এমন কিছু ‘লুমাযাহ’র মতো। ‘লুমাযাহ’- র অর্থ কী? মা ষ যখন ভাত খায় তখন তার দাঁতের ফাঁকে হয়তো এক টুকরো গোস্ত কিংবা এক টুকরো খাবার বেঁধে থাকে। যা খুঁচিয়ে বের করতে হয়। এই বেঁধে যাওয়া খাদ্য টুকরোকেই ‘লুমাযাহ’ বলে। ইমাম হোসাইনের (আ.) চোখে ইয়াযিদ, ইয়াযিদের হুকুমত, ইয়াযিদের দুনিয়া সবকিছুই ঐ এক টুকরো লুমাযাহর মতো।

তারপর তিনি বলেনঃ ‘‘হে মা ষ! জেনে রেখো যে, জগতে একমা আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নেই যার কাছে তুমি নিজেকে সোপর্দ করতে পারো। যার কাছে তুমি নিজের আত্মা ও জীবনকে বেচে দিতে পারো। তোমরা দুনিয়ার কাছে নিজেকে বেচে দিও না, স্বাধীন ও মুক্ত মা ষ হও, দাসত্বের শৃঙ্খলে নিজেকে বেঁধে ফেলো না। ইসলামের অ সারী হও। একমা ইসলামই তোমাদেরকে মুক্তি ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিতে পারে। একমা আল্লাহর ইবাদত কর। তাহলেই পরাধীনতার শৃঙ্খল তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। একমা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। একমা আল্লাহকে উপাসনা করো তাহলে দুনিয়া নিজেই তোমাদের পদতলে সমাহিত হবে।’’

কারবালার পথে অনেকেই ইমাম হোসাইনকে (আ.) বলেছে যে, এ পথ বিপজ্জনক? আপনি বরং ফিরে যান। ইমাম হোসাইন (আ.) তাদের জবাবে এ কবিতা পড়েনঃ

سَأَمْضِي وَمَا بِالْمَوْتِ عَارٌ عَلَي الْفَتَي
اِذَا مَا نَوَي حَقّاً وَ جَاهَدَ مُسْلِماً
وَ وَاسَي الرِّجَالَ الصَّالِحِينَ بِنَفْسِهِ
وَ فَارَقَ مَثْبُوراً وَ خَالَفَ مُجْرِماً
أُقَدِّمُ نَفْسِي لَا أُرِيدُ بَقَائَهَا
لِتَلْقَي خَمِيساً فِي الْهَيَاجِ عَرَمْرَماً
فَاِنْ عِشْتُ لَمْ اَنْدَمْ وَاِنْ مِتُّ لَمْ أُلَمْ
كَفَي بِكَ ذُلا اَنْ تَعِيشَ وَ تُرْغَما

‘‘আমাকে যেতে নিষেধ করছো? কিন্তু আমি অবশ্যই যাবো। আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাও? একজন বীরের কাছে কি মৃত্যু অপমানজনক? যে ব্যক্তি অসৎ ও নীচ লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ করে এবং তাতেও পৌঁছতে পারে না এদের জন্যে মৃত্যু অপমানের হতে পারে। কিন্তু যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম কাজ অর্থাৎ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নিহত হয় তার জন্যে তো অপমানের হতে পারে না! তার রাস্তা সেই রাস্তা যেখান দিয়ে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ও সৎ বান্দারা চলেছেন।

তরাং যেহেতু আমার এ পথ হতভাগ্য, পাপিষ্ট ও দুর্ভাগা ইয়াযিদের বিরোধী পথ তাই আমাকে আমার এ পথে চলতে দাও। হয় বাঁচবো না হয় মরবো- এ দুটোর বাইরে তো আর কিছু নয়।

فَاِنْ عِشْتُ لَمْ اَنْدَمْ যদি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে কেউ তখন বলতে পারবে না যে, কেন বেঁচে আছেন?

وَاِنْ مِتُّ لَمْ اُلَمْ

''আর যদি মারা যাই তাহলেও কেউ আমাকে দোষারোপ করতে পারবে না যদি সে জানে আমি কি জন্যে নিহত হলাম ?''

كَفَي بِكَ ذُلا اَنْ تَعِيشَ وَ تُرْغَما

''কিন্তু জেনে রেখো যে জীবনের জন্যে সবচেয়ে অপমান হলো কেউ বেঁচে থাকবে বটে, কিন্তু লোকে তার কান ধরে উঠাবে আর বসাবে।'' এ বক্তব্যেও পৌরুষত্ব ও বীরত্বের ছাপ পরিস্কার চোখে পড়ে। পথিমধ্যে আরেকটি বক্তৃতায় তিনি বলেন :

اَلَا تَرَوْنَ اَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَاَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَي عَنْهُ

'তোমরা চোখে দেখছো না যে সত্যকে মেনে চলা হচ্ছে না ও বাতিলের বিরুদ্ধেও কেউ কিছু বলছে না?'

اِنِّي لَا اَرَي الْمَوْتَ اِلَّا سَعَادَةً وَ الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ اِلَّا بَرَماً

''আমি মৃত্যুকেই আমার জন্যে কল্যাণকর এবং জালেমদের সাথে বেঁচে থাকাকে অবমাননা ও লজ্জাকর মনে করি।''

ইমাম হোসাইনের (আ.) সব কথা বর্ণনা করতে গেল দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে এখানে আ রার রাতের এক দিকের প্রতি ইশারা করা দরকার যে দিকগুলোর প্রতি খুব কমই লক্ষ্য করা হয়।

ইতিহাসের সব স্মরণীয় পুরুষই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, যে পরিস্থিতিতে ইমাম হোসাইন (আ.) পড়েন আ রার রাে । অর্থাৎ বস্তুগত দিক দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন এবং শত্রুকে পরাজিত করার বিন্দুমা আশা নেই বরং অতিশীঘ্রই তিনি তার সঙ্গী- সাথীসহ শত্রুদের হাতে খণ্ড- বিখণ্ড হবেন এটিই নিশ্চিত হয়ে ওঠে। অনেকেই এ মুহূর্তে অভিযোগ করেন, আফসোস করেন ইতিহাস এ ধরনের বহু ঘটনার জ্বলন্ত সাক্ষী। বলা হয় যে, নেপোলিয়ন যখন ঐ পরিস্থিতিতে পড়লো তখন বলেছিল : হায় প্রকৃতি! তুমি আমাকে এভাবেই মারলে।

কিন্তু ইমাম হোসাইন (আ.) সবকিছু বুঝতে পেরেও মৃত্যু নির্ঘাত জেনেও আ রার রাতে কী বলছেন? তিনি সঙ্গী- সাথীদেরকে সমবেত করলেন যেন যে কোনো বিজয়ীর চেয়েও তার মানসিকতায় উজ্জ্বলতার ঢেউ খেলে যাচ্ছে । তিনি বললেন :

اَثْنِي عَلَي اللهِ اَحْسَنَ الثَّنَاءِ وَ اَحْمَدُهُ عَلَي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَحْمَدُكَ عَلَي اَنْ اَكرَمْتَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَ عَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ وَ فَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ

যেন সবকিছুই ইমাম হোসাইনের (আ.) অ কূলে আছে এবং সত্যি - সত্যিই সবকিছু তার অ কূলে ছিল। কেননা এ পিরিস্থিতি একমা তার জন্যেই দুঃখবহ ও প্রতিকূল, যে কেবল দুনিয়া ও ক্ষমতা চায় আর ব্যর্থ হয়ে এখন মৃত্যুর প্রহর গুণছে। কিন্তু যার সবকিছুই আল্লাহর জন্যে, এমন কি যদি হুকুমতও চান তাহলেও তা আল্লাহর জন্যই চান এবং জানেন যে আল্লাহর পথেই এগিয়ে এসেছেন তাহলে তার কাছ তো এ পিরিস্তিতি অবশ্যই অ কূল। এজন্যে তিনি আল্লাহর কাছে শোকরগুজারী- ই তো করবেন।

‘‘আল্লাহকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রশংসা জানাই এবং খে- দুঃখে সব অবস্থাতেই তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ আমাদেরকে নবুওয়াত দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে কোরআনের জ্ঞান দিয়েছেন এবং আপনার দীন পালনে আমাদেরকে সফল করেছেন- তাই আপনার লাখো শোকরিয়া আদায় করছি।’’

মোটকথা আমরা দেখলাম যে, এ আন্দোলনের গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত কেবল পৌরুষত্ব, বীরত্ব, সত্যা সরণ এবং সত্যপূজা। কিন্তু এ বীরত্ব কোনো গো বা দেশ বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, এতে কোনো ‘‘আমিত্ব’’ এবং আত্মস্বার্থ নেই। সবই ও সবকিছুই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর পথে। তিনি এ পথে শেষ নিশ্বাস নেয়া পর্যন্ত ও অটল ছিলেন। যুদ্ধক্লান্ত ইমাম হোসাইন (আ.) যখন শেষ তীর খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন তখনও সে কেবলা থেকে কখনও পথভ্রষ্ট হননি যে কেবলার দিকে ফিরে পরম শান্তিতে বললেন

رِضاً بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ وَلَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

‘আপনার বিচারে আমি সন্তুষ্ট, আপনার আদেশের প্রতি আমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই হে অসহায়দের সহায়।’ (বিহারুল আনোয়ারঃ ৪৪/৩৮৩, তুহাফুল উকুলঃ ১৭৬, আল- লুহুফঃ ৩৩, মাকতালু মোকাররামঃ ২৩২, তারিখে তাবারীঃ ৬/২২৯, তারিখে ইবনে আসাকেরঃ ৪/৩৩৩, কাশফুল গোম্মাহঃ ২/৩২)

হোসাইনী আন্দোলন মুসলিম সমাজের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আন্দোলন

সব মুসলমানই বিশ্বাস করে যে, ইমাম হোসাইন (আঃ) স্বীয় প্রাণকে কোরবানি করে ইসলামের প্রণকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তার বুকের রক্ত দিয়ে ইসলামের চারাগাছকে পুষ্ট ও সজীব করে তুলেছেন। আমরা এ সত্য বিশ্বাস করি বলেই ইমাম হোসাইনের (আঃ) যিয়ারত পড়ার সময় আমরা বলিঃ

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ اَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নামায কায়েম করেছেন, যাকাত প্রদান করেছেন, সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন, অসৎকাজে বাধা দিয়েছেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। (মাফাতিহুল জিনান)

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে ইমাম হোসাইনের (আঃ) প্রাণ হারানোর সাথে ইসলামের প্রাণ ফিরে পাবার মধ্যে কি সম্পর্ক থাকতে পারে? কেননা রক্তপাত ঘটলেই যে ইসলাম শক্তি লাভ করবে- এমনতো কোনো কথা নেই। ইমাম হোসাইনের (আঃ) শাহাদাত ও ইসলামের পুনরুজ্জীবনের মধ্যকার যে নিগুঢ় সম্পর্ক আছে বলে আমরা দাবি করে এসেছি এবং ইতিহাসও যে সম্পর্ককে সাক্ষ্য দেয় সেটা আসলে কতদুর সত্য - সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই বলে রাখি যে, আমরা যদি পূর্বালোচিত অধ্যায়গুলো ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাহলে এই সম্পর্কের নিগুঢ়তত্ত্ব উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে।

যদি ইমাম হোসাইনের (আঃ) শাহাদাত স্রেফ একটি দুঃখজনক ঘটনা কিংবা একজন নিরপরাধ মা ষের অনর্থক হত্যার ঘটনা হতো তাহলে তিনি হয়তো বড় জোর একজন সম্মানীত ব্যক্তি হিসেবেই বিবেচিত হতেন। কিন্তু তার এ আত্মদানের সূ ধরে মুসলিম বিশ্বে যে আমূল পরিবর্তন এবং দূর প্রসারী ও সাড়া জাগানো প্রভাব পড়েছিল- তা কখনোই হত না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হোসাইনী আন্দোলন মুসলিম বিশ্বকে যেভাবে ‘‘মুক্তি সোপান’’ হিসেবে পথ দেখিয়ে এসেছ

তার কারণ হলো, এ আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণভাবে ইসলামী ও ঐশী আদর্শে অ প্রাণিত একটি আন্দোলন। তদুপরি এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন এমন একজন কালজয়ী মহান বীরপুরুষ যিনি তলোয়ারের উপরে রক্তের বিজয় এনে সত্যের পতাকাকে উন্নীত করেছেন। তিনি মুসলিম সমাজের শিরায় শিরায় নতুন প্রাণস্পন্দন জাগিয়েছেন।

আগই বলা হয়েছে যে, কোনো মহান ও বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হলো যে, তা মা ষের অন্তরের গভীরে বীরত্বের সাড়া জাগায়। রক্তের কণায় কণায় মুক্তিকামী স্পৃহা সঞ্চার করে দেয় এবং সকল গাফলতি ও অচৈতন্যের কালো অমানিশার অবসান ঘটিয়ে সমাজে জাগরণের ঢেউ সৃষ্টি করে।

অনেক সময় দেখা যায় কোনো রক্তাক্ত ঘটনা মা ষকে সজাগ ও প্রাণবন্ত না করে বরং তাদের মধ্যে ভয়- ভীতি ও হতাশার বীজ ছড়ায়। তাদের রক্তে জোয়ার না এনে তাকে জমাটবদ্ধ করে দেয়। তার কারণ হলো এসব ঘটনায় কেবল অনর্থক রক্তপাত, প্রাণহানি এবং নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি হয়। আবার এমন অনেক ঘটনা আছে যা রক্তাক্ত বটে কিন্তু এ সমস্ত ঘটনা সমাজকে মুক্তিকামী এবং শূচি- ভ্র করে তোলে। ব্যক্তিগত ক্ষে ও দেখা যায় কোনো কোনো কাজ আমাদের অন্তরকে কালিমায় লিপ্ত করে দেয়। পক্ষান্তরে, কিছু কিছু কাজ আছে যা করলে আমাদের অন্তর নির্মল এবং ভ্র হয়ে ওঠে। সমাজের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য । কোনো কোনো ঘটনা সমাজের প্রাণসত্তাকে কলুষময় করে দেয়, হতাশা- নিরাশা আর ভয়- ভীতি সঞ্চারণের মাধ্যমে সমাজকে হীনবল ও দাসত্ব করার মনোবৃত্তি সম্পন্ন করে তোলে। অথচ এমন কিছু ঘটনা আছে যা সমাজকে দাসত্বের থেকে মুক্ত করে, দুর্বার সাহসী ও সকল পঙ্কিলতা দূর করে তাকে স্বচ্ছ করে তোলে।

ইমাম হোসাইনের (আঃ) শাহাদাতের পরে মুসলিম সমাজও এভাবে সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করার যোগ পেল। সমাজের সকল পঙ্কিলতা দূর হয়ে সেখানে প্রবেশ করলো শান্তির মুক্ত - শীতল বায়ু । তিনি চরম বীরত্বের সাথে শক্তহাতে মুসলিম সমাজের হারানো ব্যক্তিত্বকে পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন। তিনি সেই কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত হানলেন যার ফলশ্রুতিতে সেখান থেকে প্রতিটি

মুসলমান একেকজন মুমীন, সাহসী, সত্যান্বেষী ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করলো।

ব্যক্তিত্বের অ ভূতি অমূল্য সম্পদ। সমাজের জন্যে এ সম্পদ অনেক বড় জিনিস। যে সমাজ আত্মশক্তিতে বলীয়ান, যে সমাজ একটি স্বাধীন আদর্শ ও স্বতন্ত্র জীবনদর্শন অ সরণ করে বেঁচে থাকে, যে সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্বোপরি যে সমাজের ব্যক্তিত্বের অহংকার আছে- তার চেয়ে ধন্য ও সমৃদ্ধ সমাজ কি হতে পারে?

যে সামজ স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকিয়ে দিয়ে পরের দাসত্বকে মেনে নেয় তার চেয়ে জঘন্য সমাজ দ্বিতীয়টি নেই। ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলা সমাজের জন্যে দূরারোগ্য ব্যাধির সমতুল্য । এতে সমাজ উন্নত ও মহান না হয়ে অধঃপতনের অন্ধ কুয়ায় বিলীন হয়ে যায়।

স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবনদর্শনকে বিকিয়ে দিলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু কোনো জাতি যদি সব কিছুকে হারিয়েও তার স্বীয় স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তিত্বকে অটুট রাখতে পারে তাহলে অচিরেই সে পুনরায় সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ একমা যে জিনিস কোন সমাজ কিংবা ব্যক্তিত্বকে অন্য কোনো সমাজের বা ব্যক্তির হাতে বিলুপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে তা হলো ঐ সমাজের বা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা চরমভাবে পরাজিত হয় এবং অপূরণীয় ক্ষয়- ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তারপরও তারা বলেছিলঃ আমরা হয়তো সবকিছুই হারালাম কিন্তু আমাদের কাছ থেকে একটি জিনিস কেউ কেড়ে নিতে পারেনি, তাহলো আমাদের স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিত্ব । আর এই ব্যক্তিত্বের অ ভূতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বলেই অচিরেই জার্মানরা তাদের হারানো স্থান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু কোনো জাতি যদি সব কিছুর মালিক হয়েও তার স্বাতন্ত্র্যবোধকে বিকিয়ে দিয়ে বসে তাহলে তাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন । নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়ে সে অন্য জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজ আমাদের মুসলিম দেশগুলোর অনেকেই প্রকৃতির দেয়া অঢেল ধন- সম্পত্তির মালিক এবং অতীতের দীর্ঘ উজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের পাশ্চাত্যের দাসত্ব করতে লজ্জাও করে না।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ আল্লামা ইকবাল লাহোরী বলেন, মুসোলিনীর মতেঃ মা ষ যদি রুটি চায় তাহলে তার অস্ত্র থাকতে হবে। অর্থাৎ খাবার হাতে আনতে হলে বাহুর জোর থাকা চাই। মুসোলিনীর এই মতকে খণ্ডন করে আল্লামা ইকবাল বলেনঃ যদি রুটি পেতে চাও তাহলে তুমি নিজেই অস্ত্র হও। অর্থাৎ, তুমি দৃঢ় হও, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করো। তিনি বলেন, কেন শক্তির আশ্রয় নিতে চাও? তুমি শক্ত হও। তুমি নিজে লৌহমানব হও, তোমার ব্যক্তিত্বকে অটুট রাখো তাহলেই তুমি যা চাইবে তা পাবে।

যদি কোনো হতভাগা জাতি তার স্বীয় জীবন- দর্শন থেকে গৃহীত ঈমানকে বিসর্জন দিয়ে অন্য কোনো জাতির মধ্যে মিলে যায় তাহলে সবক্ষে সে তাদের মতোই চিন্তা করতে থাকে, তাদের মতোই চলতে থাকে। কোনো ব্যাপারেই সে আর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তখন যেকানো অশ্লীলতাকে সেও মেনে নেয়। তাদের চাটুকারিতা করতেই তখন তার ভাল লাগে।

এ প্রসঙ্গে কয়েক বছরের আগের একটি ঘটনা উল্লেখ্য। মস্কোতে নিযুক্ত ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাষ্টদূতের এক মেয়ে জৈনক কৃ াঙ্গ ছেলের প্রেমে পড়ে। রাষ্টদূত স্বাভাবিকভাবেই একজন তথাকথিত নামিদামি ভদ্র লোক ছিলেন। যখন তার মেয়ে এক নিগ্রো ছেলের সাথে বিয়ে করে তখন ইংল্যান্ডে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায় কিভাবে একজন নামি দামি লোকের সাদা চামড়ার মেয়ে একজন কালো চামড়ার ছেলেকে বিয়ে করলো? সারা দেশ জুড়ে বেশকিছু দিন হৈ- হুল্লোড় চললো, প - পি কাও দাপটে ব্যবসা চালালো। তারপর একটি পি কায় লেখা হল যে, এ তো কোনো অদ্ভুত ঘটনা নয়। পৃথিবী এখন উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সাদা- কালো আজ কোনো ব্যাপারই নয়। ইসলাম একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে ১৪০০ বছর আগেই সাদা- কালোর ব্যবধান বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে।

এ পি কার বক্তব্য নিয়ে কয়েকজন ব্রিটিশ এক মিটিং করে। সেখানে কয়েকজন মুসলমান যুবকও ছিল। আলোচনায় বলা হল যে, ওমুক পি কা ইসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে যে, ইসলাম কালোদেরকেও সম্মান দিয়েছে ও তাদেরকে সাদাদের সমান বলেই ঘোষণা করেছে। এর জবাবে আরেকজন বলে ওঠে যে, ইসলাম এক নোংরা ধর্ম বলেই নোংরাদেরকে সমর্থন

করেছে। এ কথা নে মুসলমান যুবক দু'টি ও বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা ভাবলো যে, আমরা এমন এক দীনের অ সারী যা প্রকৃতই নোংরা তা না হলে কালো এবং সাদার মধ্যে যে পার্থক্য আছে এটি কেন ইসলাম স্বীকার করে না। একই বলে ব্যক্তিত্ব বিকিয়ে দেয়া। এই দু'জন যুবক মুসলমান বটে। কিন্তু তাদের মুসলিম ঐতিহ্যকে বিকিয়ে দিয়ে এমন এক পরিবেশে বিলীন হয়ে গেছে যে, তাদের আর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। অন্য লোকের ভ্রান্ত চিন্তার ছাঁচেই সেও তার চিন্তাকে বেঁধে নিয়েছে। তাদের ঐ ভ্রান্ত চিন্তার একটি দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবার বদলে নিজেরাই শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা মনে করে যেহেতু ইউরোপীয়রা এরকম মনে করে সেহেতু এটিই ঠিক।

সত্যকে পাওয়া মা গ্রহণ করার অভ্যাস অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সত্য ও সততাকে বিকিয়ে দেয়া সবচেয়ে কু- অভ্যাসগুলোর অন্তর্গত। গান্ধী কিংবা নেহেরু ঐ নিজস্ব পোশাক নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন তাতে তো তাদের কোনো অসম্মান হয়নি। বরং তার ভারতীয় সত্তার পরিচয়টিই বিদেশে ফুটে উঠে। যারা দেশীয় সংস্কৃতির বদলে বিদেশী ভাষা- সাংস্কৃতিকে সাদরে গ্রহণ করে নেয় তারা কাপুরুষ ছাড়া কিছু নয়। এরা প্রদেশের, সমাজের ও জাতির কুলাঙ্গার।

আরবী হরেফ লেখা তুর্কী ভাষা আতাতুর্কের পছন্দ হল না। তাই সে ল্যাটিন হরফে তুর্কী ভাষার প্রবর্তন ঘটালো। (খোদা না করুক) হয়তো দেখা যাবে একিদন পশ্চিমাভক্ত আরব রাজা-বাদশাহদেরও আরবী অক্ষরে আরবী ভাষা পছন্দ হবে না। তারাও দেখা যাবে ল্যাটিন অক্ষরে আরবী ভাষার চলন করবে। পরিণতিতে মহাপবি খোদায়ী আল কোরআনের আর সহজভাবে অর্থ করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো ইসলাম ধর্মই থাকবে না। মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও মুসলিম ঐতিহ্যকে হয়তো পুরোপুরি হারিয়ে বসতে হবে।

মহানবী (সাঃ) এসে আরবেদেরকে কি দিয়েছিলেন? বস্তুত একজন গরীব ও অনাথ ব্যক্তি যেখানে সমস্ত গো এবং সমাজ তার বিরোধিতায় নেমেছে তাদেরকে কি- ই বা দিতে পারতেন। কিন্তু তবুও কিভাবে তিনি তাদেরকে ঐ নরকালয় থেকে বের করে সম্মানের চুড়ায় এনে বসাতে পরলেন?

তিনি সমাজে এমন এক ঈমানী শক্তি প্রবাহিত করে দিলেন যা তাদেরকে ব্যক্তিত্ব –সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। ফলে যে আরবরা গতকাল উটের দুধ খেয়ে জীবন যাপন করতো, হিংস্র জন্তু খেত, দ ্যতা যাদের পেশা ছিল, যে মূর্খ পাষণ্ড আরবরা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত, তারাই আজ হঠাৎ করে হুশ ফিরে পেল। ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে তারা বলে উঠলো যে, আমাকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস করা থেকে বিরত হতে হবে। অতীতে কি করতো না করতো তা আর ফিরে দেখার প্রয়োজন বোধ করলো না, বরং গর্ব করে বলতে লাগলো; দেখা, আমি গতকাল এরকম অধম ছিলাম, এরকম বঞ্চিত চিন্তা- ভাবনা করতাম কিন্তু আজকে আমি সোনার মা ষ। আমি তোমাদের চেয়েও উন্নত চিন্তা করার শক্তি অর্জন করেছি। একেই বলে ব্যক্তিত্ব । পৃথিবীতে ‘‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’র চেয়ে ভাল কোনো কালেমা খুজে পাওয়া যাবে কি যা মা ষের অন্তরকে অধিকতর ব্যক্তিত্ব এবং বীরত্ব দান করতে পারে? আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এসব গ্রহ- তারা, প - পাখী, মাটি- পাথর, গাছ- গাছালি কোথায় আর মা ষের মাথা অবনত করা কোথায়? আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করতে পারবো না। আমি সত্য, ন্যায় এবং মান- সম্মানের পক্ষপাতী। এগুলো হলো ব্যক্তিত্ব থেকে উদ্ভূত মনোবৃত্তি ।

কিন্তু উমাইয়ারা এসে এমন কিছু করলো যাতে মুসলমানদের ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহ্য বিলীন হয়ে যায়। কুফা মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রভূমি ছিল। ইমাম হোসাইন (আঃ) যদি সেদিন কুফার লোকদের দাওয়াত অ যায়ী কুফায় না আসতেন তাহলে অনাদিকালের ঐতিহাসিকরা তাকে দোষারোপ করে বলতো, হাজার হাজার লোক আপনার প্রতিনিধির সাথে বাইয়াত করেছে, তারা আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৮ হাজার চিঠি পাঠিয়েছে, কিন্তু আপনি কেন তাদের দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে এত বড় ভূল করলেন? কুফার চেয়ে অ কূল কোনো জায়গা আর ছিল কি?

ইমাম হোসাইন (আঃ) সবকিছু বুঝে সবচেয়ে উত্তম পথেই পা বাড়ালেন। কিন্তু হাজার হাজার মুসলিম সেনারা যারা ইমাম হোসাইনের (আঃ) জন্যে বাইয়াত করে তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাওয়াত করলো; ইবনে যিয়াদের লেজ দেখেই তারা সব ছ ভঙ্গ হয়ে গেল কেন? কারণ

ইবনে যিয়াদের বাবাকে সবাই চিনতো। সে দীর্ঘদিন ধরে কুফায় শাসন করে কত মায়ের অশ্রু ঝরিয়েছে, কত লোকের হাত- পা কেটে পঙ্গু করে দিয়েছে, কত মা ষের পেট চিরে কলিজা বের করে এনেছে, কত মা ষকে বন্দি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে- এসবই কুফাবাসীদের ভালমতো মনে ছিল। তাই ইবনে যিয়াদকে দেখে কুফাবাসীদের মনে তার বাবার নৃশংসতার কথা স্মরণ হয় এবং তাতেই তাদের সমস্ত বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব পানি হয়ে যায়। তাই ইবনে যিয়াদের কুফায় আগমনের সংবাদ শোনা মা মা সন্তানের হাত ধরে, স্বামী স্ত্রীর হাত ধরে, ভাই বোনের হাত ধরে মুসলিম ইবনে আকিলের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে রু করে। কুফায় হযরত আলী (আঃ)- এর অ সারীরাও ছিল প্রচুর। কিন্তু তারা এমন দিশেহারা হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত নিজের হাতেই ইমাম হোসাইনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সে সময় বলা হলোঃ

قُلُوبُهُمْ مَعَهُ وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْهِ

''তাদের অন্তরগুলো ইমাম হোসাইনের (আঃ) সাথেই ছিল কিন্তু তাদের তলোয়ারগুলো ইমাম হোসাইনের (আঃ) বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয়।"

(মাকতালুল মোকাররামঃ ২৩০, তারিখে তাবারীঃ ৬/২১৭, কামেলে ইবনে আছীরঃ ৬/১৫, ইরশাদে মুফীদঃ ২১৮, মানাকিবে ইবনে শাহের আ বঃ ৪/১৯৫, কাশফুল গোম্মাহঃ ২/৩২)

এর কারণ হলো উমাইয়ারা মুসলিম সমাজের ব্যক্তিত্বকে ভূ- লুন্ঠিত করে দেয়, মুসলমানদের ঐতিহ্যকে পদদলিত করে। ফলে আর কেউই নিজেদের মধ্যে ইসলামী অ ভূতি খুজে পায়নি। সবাই যেন ইবনে যিয়াদের মধ্যে হারিয়ে গেল।

কিন্তু এই কুফাবাসীরাই এ ঘটনার মা তিন বছর পরেই বিপ্লব করে। পাঁচ হাজার ''তাওয়াব'' বা অ তপ্ত ব্যক্তি ইমাম হোসাইনের (আঃ) রওজায় গিয়ে আহাজারি করে অশ্রু ঝরায়। তারা নিজেদের পাপের জন্যে তওবা করে ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে যতক্ষণ ইমাম হোসাইনের (আঃ) রক্তের প্রতিশোধ না নিতে পারবে ততক্ষণ শান্ত হবে না। হয় নিহত হবে না হয় এর প্রতিশোধ নেবে। যেমন কথা তেমন কাজ। ১২ই মহররম অর্থাৎ, আ রার মা দু'দিন পর রু হল তাদের

অভিযান এবং শেষ পর্যন্ত এরাই কারবালায় নবীর (সাঃ) সন্তানদের হত্যাকারীদেরকে ধ্বংস করলো।

তাদের এ অ ভূতিকে কে ফিরিয়ে দিল? অবশ্যই ইমাম হোসাইনের (আঃ) আন্দোলন। কোনো জাতিকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন করার অর্থ হলো সে জাতিকে দেশ প্রেমিক ও শ্রদ্ধাবান করে তোলা। যে জাতির মধ্যে এগুলো ধুলোর আবরণে ঢাকা পড়েছে তাকে ঝেড়ে- মুছে পুনরায় প্রাণবন্ত করা। ইমাম হোসাইন (আঃ) যেখানেই আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন সেখানেই বলেছেনঃ

وَ عَلَي الْاِسْلَامِ السَّلَامُ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْاُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيدٍ

''যদি ইয়াযিদের মতো কাপুরুষ উম্মতের অভিভাবক হয় তাহলে এখানেই ইসলামের সমাপ্তি ঘটবে।'' তিনি আরও বলেনঃ

اِنِّي لَمْ اَخْرُجْ اَشِراً وَلَا بَطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ اِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْاِصْلَاحِ فِي اُمَّةِ جَدِّي.

''আমি কোনো ক্ষমতা বা পদের লোভে নয় বরং আমি আমার নানার উম্মতের মধ্যে সংস্কার করার জন্যেই বিদ্রোহে নেমেছি।'' ২৩ বছর ধরে যেসব কথা মরে গিয়েছিল সেসব কথাকে পুনর্জাগরুক করার জন্যে তিনি একজন সংস্কারক হিসেবে বিদ্রোহ করলেন। নানার উম্মত আজ নানার পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাই ইমাম হোসাইন (আঃ) উম্মতকে নানার পথে আনতে চান। তিনি বিদ্রোহ করে উম্মতকে পুনরায় সত্য প্রেমিক ও আদর্শবান করে তুললেন। কোনো জাতির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করার পথও এই একটি । সেই জাতিই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বনির্ভরতার অ ভূতি রয়েছে। এসবগুলোই হোসাইনী আন্দোলনের শিক্ষা যা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তিনি মুসলিম সমাজকে স্বনির্ভর হওয়ার মনোবৃত্তি দান করেন। যেদিন ইমাম হোসাইন (আঃ) মদীনা থেকে রওয়ানা হন সেদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বনির্ভরভাবেই পদক্ষেপ রু করেন। তিনি বলেনঃ

''আল্লাহ চাহেন তো আমি আগামীকাল সকালেই রওয়ানা হচ্ছি । তোমাদের মধ্যে যে জীবনকে সত্যের পথে উৎসর্গ করতে পারবে এবং আল্লাহর দিদার পেতে প্রস্তুত সে আমার সঙ্গী হতে

পারো। আমার মতো আমি চললাম। এর বেশী কোন কথা নেই।' (মুলহাকাতু এহকাকুল হকঃ ১১/৫৯৮, নাফা ল মাহমুমঃ ১০০, কাশফুল গোম্মাহঃ ২/২৯ আল লুহুফঃ২৫, মাকতালুল খারাযমিঃ ২৮৫, বিহারুল আনোয়ারঃ ৪৪/৩৬৬)

এতটুকু আত্মনির্ভরতা ও অভাব মুক্তির নজীর পৃথিবীতে নেই। এর চেয়েও বড় আত্মনির্ভরতার পরিচয় তিনি দেন আ রার রাে । তিনি তার মুষ্টিমেয় সাহায্যকারীদের থেকেও বাইয়াত তুলে নিয়ে তাদেরকে বিপদমুক্তির সমস্ত পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেনঃ তোমরা যদি চলে যেতে চাও অনায়াসে যেতে পার। এমন কি কেউ ইমাম হোসাইনের (আঃ) মুখের দিকে চেয়ে মায়ায় পড়ে চলে যেতে দ্বিধা- দ্বন্দে পড়ে কিনা এ কারণে ইমাম হোসাইন (আঃ) আলো নিভিয়ে দিলেন। তিনি একবারও বললেন না যে, আমি একাকী হয়ে পড়বো, অসহায় হয়ে যাব। কত বড় আত্মবিশ্বাস ও নির্ভরতার শিক্ষা ইমাম হোসাইন (আঃ) শেখালেন।

এই আত্মনির্ভরতার শিক্ষা কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। এই আত্মনির্ভরতাই মুসলমানদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে ও এ সূ ধরে কত শত শত বিপ্লব এবং বিদ্রোহ পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। ইমাম হোসাইন (আঃ) মুসলমানদেরকে ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমী হতে শিক্ষা দিয়েছেন। এসবই মুসলমানদের মূলধন হিসেবে কাজে লাগে। তরাং যদি কেউ বলে যে, ইমাম হোসাইনের (আঃ) শাহাদাতের সাথে ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হবার মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে; তাহলে জবাবে বলতে হবে যে, ইমাম হোসাইন মুসলমানদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন, রক্তের মধ্যে জোয়ারের বান তোলেন, মুসলমানদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব এবং হিম্মতকে ফিরিয়ে দিলেন। তাদেরকে সত্যপ্রিয় এবং আদর্শবান করে তোলেন, আত্মনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হতে শেখান। তাদেরকে বিপত্তি ও প্রতিকূল পরিবেশে ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হতে শেখান, ভয়- ভীতির অবসান ঘটিয়ে দৃঢ়ভাবে দাড়াতে শেখান, ভয় ভীতির অবসান ঘটিয়ে দৃঢ়ভাবে দাড়াতে শেখান। যে লোকগুলো ঐ পরিমাণ ভীতসন্ত্রস্ত ছিল তাদের সবাইকে একেকজন সাহসী বীরপুরুষ করে গড়ে তোলেন।

ইমাম হোসাইনের (আঃ) জন্যে শোক- পালন করা, মার্সিয়া পড়া- এসবের কেউ বিরোধিতা করে না। তবে এগুলো এমনভাবে পালন করা উচিত যাতে হোসাইনী বীরত্ব আমাদের প্রতিটি

রক্তকণায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। ইমাম হোসাইন (আঃ) সর্বকালের জন্যে একটি সামাজিক আদর্শ। সেদিনও এ আদর্শ মুসলিম সমাজকে আলোড়িত করেছিল। যারাই অন্যায়ের গলা চেপে ধরতে এবং সৎকাজের উপদেশ কিংবা অসৎকাজে বাধা দিতে অগ্রণী হতো তাদের সবার স্লোগান ছিলঃ

يا لثارات الحسين

'হে হোসাইনের রক্ত' (মুসনাদে ইমাম রেযাঃ ১/১৪৮ উয়ু ল আখবার আর রেযাঃ ১/২৯৯)

তাই, আজকেও অন্যায়ের পথ রুখতে, নামায কায়েম করতে, ইসলামকে পুনর্জাগরিত করতে ও মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের মহান ঐতিহ্য এবং অ ভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হলে ইমাম হোসাইনের (আঃ) আদর্শে আদর্শবান হতে হবে। এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু লেখার ছিল। তবুও আর দীর্ঘ না করে এবার পবি কোরআনের এক আয়াত নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। পবি কোরআনের রা আনফালের ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

(يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكمْ لِمَايُحْيِيكُمْ)

''হে মুমিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদেরকে জীবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিবে।''

অধিক ধন- সম্পত্তিই এক জাতির প্রকৃত জীবন নয়। এমন কি ধু জ্ঞানের ভান্ডার নিয়েও কোনো জাতি বেঁচে থাকতে পারে না। কোনো জাতির প্রাণ হলো তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য । পৃথিবীতে অনেক জাতি হয়তো খুবই জ্ঞানী অথচ তাদের ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু নেই। পক্ষান্তরে, হয়তো কতো মূর্খ জাতিও রয়েছে কিন্তু তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে ঠিক ঠিকভাবে বজায় রেখেছে। দেড়শ' বছর ধরে সংগ্রাম করে আলজেরিয়ার জনগণ যদি সম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সকে নাকানি চুকানি খাইয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয় তবে তা কেবল তাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অ ভূতি দিয়েই সম্ভব হয়েছিল। দারিদ্র ও স্বল্প জনসংখ্যার দেশ ভিয়েতনাম যদি শক্তিধর বড় শয়তান আমিরকার পিঠ ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয় তাহলেও তা কেবল ভিয়েতনামীদের ব্যক্তিত্বের বলেই

সম্ভবপর হয়েছিল। তাদের জনসংখ্যা কিংবা শক্তি কোনটিই বেশী ছিল না। ধু যে জিনিসটি পুঁজি করে তারা সংগ্রাম করে তাহলো তাদের ব্যক্তিত্বের জোর। তাদের স্লোগান ছিল একটিইঃ আমরা অন্য কারো মুরব্বীয়ানা মানি না। যদি বাচতেই হয় তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়াবো তা না হলে মরবো। কিন্তু অন্যের কথায় উঠা- বসা আমাদের মানায় না।

ইমাম হোসাইনের এই বীরত্বের প্রভারশ্মি সবচেয়ে বেশি যার উপর প্রতিফলিত হয়েছিল তিনি হলেন তার যোগ্য বোন হযরত যয়নাব। হযরত যয়নাব বিশ্বজননী হযরত ফাতেমার কোলে বড় হন। প্রথম থেকেই তিনি একজন মহতী নারী ছিলেন। তারপরও কারবালার পরের যয়নাবের সাথে কারবালার আগের যয়নাবের ঢের তফাত পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ কারবালার পর হযরত যয়নাব (আঃ) আরও বেশী ব্যক্তিত্বসম্পন্নও মহতী হয়ে ওঠেন।

আ রার রাতের দুর্বিষহ অবস্থা দেখে হযরত যয়নাব দু'একবার কেঁদেও ফেলেন। একবার ইমাম হোসাইনের (আঃ) কোলে মাথা রেখে তিনি এতোই কাঁদলেন যে, বেহুশ প্রায় হয়ে পড়েন। ইমাম হোসাইনের (আঃ) বিভিন্ন ভাবে তাকে শান্ত করেন। তারপর বলেন,

لَا يُذْهِبَنَّ حِلْمَكَ الشَّيْطَانُ

''বোন আমার! শয়তান যেন তোমার ধৈর্যচ্যুতি না ঘটায়।'' (এ'লামুল ওরাঃ ২৩৬, ইরশাদে মুফীদঃ ২৩২ বিহারুল আনওয়ারঃ ৪৫/২)

তিনি হযরত যয়নাবকে (আঃ) বলেনঃ আমাদের নানাইতো এপথ দেখিয়ে গেছেন। বাবা- মা- ভাই সবাইতো এপথে শাহাদাত বরণ করেছেন। এতে তো গৌরব ছাড়া কাঁদার কিছুই নেই।

হযরত যয়নাব (আঃ) নিজেকে কিছুটা সংযত করে বলেনঃ 'আমি কোনো কষ্টের জন্যে কাঁদছি না। আমার দুঃখ হলো এ কারণে যে, নানাকে হারিয়েছি, বাবাকে হারিয়েছি, মাকে হারিয়েছি, বড় ভাই হাসানকে (আঃ) হারিয়েছি। তারপরও এতদিন আপনার দিকে চেয়ে আমি সব দুঃখ ভুলেছিলাম। কিন্তু আজ তোমাকেও হারাতে হবে তাই আমার কষ্ট হচ্ছে ।

অথচ কারবালার ঘটনার পরমুহূর্ত থেকে হযরত যয়নাব আর আগের যয়নাব রইলেন না। ইমাম হোসাইনের শৌয- বীর্য এবং ধৈর্য দেখে তিনি এমন মানসিকতা অর্জন করলেন যে, যতবড়

ব্যক্তিত্বই হোক না কেন, যয়নাবের (আঃ) সামনে সে তুচ্ছ । ইমাম যয় ল আবেদীন (আঃ) বলেনঃ আমরা বারজন ছিলাম। সবাইকে এক শিকলে বেঁধে শিকলের একমাথা আমার বাহুতে এবং অন্য মাথা আমার ফুফুর বাহুতে বেঁধে দেয়া হয়।

বলা হয় যে, নবী পরিবারকে ২রা সফর তারিখে বন্দী অবস্থায় সিরিয়ায় নিয়ে আসা হয়। এ হিসাব অ যায়ী কারবালার ঘটনা থেকে যখন বাইশদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তখন বন্দীদেরকে ইয়াযিদের সবুজ প্রাসাদে নেয়া হল। সবুজ প্রাসাদ মুয়াবিয়ার তৈরী।

এই প্রাসাদ ঝলমলে, রাজকীয় সাজে সজ্জিত, আয়া- খানসামাদের ভিড় প্রভৃতিতে ভরা ছিল এবং কেউ এর মধ্যে ঢুকলে হতবাক হয়ে পড়তো। বলা হয় যে, সাত সাতটা বড় বড় হল ঘর পার হলে তারপর ইয়াযিদের মনিমাণিক্য খচিত দরবারে আসা যেত। সেখানে ইয়াযিদ দাস- দাসী, উযির - নাযির সবাইকে নিয়ে বসে আছে। এমনি অবস্থায় বন্দী নবী পরিবারকে দরবারে আনা হল। কিন্তু হযরত যয়নাব (আঃ) এত দুঃখ- কষ্ট সহ্য করার পরও ইয়াযিদের দরবারে এমন সাহসী ভূমিকা নিলেন যে, সমস্ত দরবার কেঁপে উঠলো এবং উপস্থিত সভাসদরা হাউমাউ করে কাঁদতে রু করলো। এমন কি বাকপটু ইয়াযিদও সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে গেল। ইয়াযিদ প্রথমে গর্বভরে তার বিজয় উল্লাস করছিল। সাথে সাথে হযরত যয়নাব (আঃ) বাঘের মতো গর্জে উঠে বললেনঃ

اَظَنَنْتَ يَا يَزِيدُ حَيْثُ اَخَذْتَ عَلَيْنَا اَقْطَارَ الْاَرْضِ وَ آفَاقَ السَّمَاءِ فَاَصْبَحْنَا نُسَاقُ آكمَا تُسَاقُ الْأُسَارَي اَنَّ بِنَا عَلَي اللهِ هَوَاناً وَ بِكَ عَلَيْهِ كرَامَة ؟

‘হে ইয়াযিদ খুব যে ফুর্তি করছো! আমাদেরকে এই হালে ফেলে ও নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে বোধ হয় মনে করছো যে, পৃথিবীর সব কিছু থেকে আমাদের বঞ্চিত করে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নেয়ামত লাভ করেছ। আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমার দৃষ্টিতে তোমার মতো কাপুরুষ আর কেউ নেই। আমার দৃষ্টিতে তোমার এক কানাকিড়ও মূল্য নেই।’ (আল লুহুফঃ ৭৬, মাকতালুল মোকাররামঃ ৪৬২ বিহারুল আনওয়ারঃ ৪৫/১৩৩)

একবার লক্ষ্য করুন যে, কেবল ঈমান ও ব্যক্তিত্ব ছাড়া সবকিছু হারিয়েছেন এবং বর্তমানে বন্দী অবস্থায় সবচেয়ে জঘন্য লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন- এরকম একজন মহিলার কাছ থেকে কী

আশা করা যেতে পারে? কিন্তু দেখুন হযরত যয়নাব (আঃ) এমন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন যে, অতি শীঘ্রই শামে বিপ্লবের ঘনঘটা রু হয়।

ঐ দরবারে বসেই ইয়াযিদ তার কৌশল বদলাতে বাধ্য হয়। বন্দীদেরকে সসম্মানে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তারপর নিজে অ তাপ প্রকাশ করে ও ইবনে যিয়াদকে অভিসম্পাত করে বলে আমি ওকে এ কাজ করতে আদেশ দেইনি। সে নিজেই একাজ করেছে। এই বিপ্লব কে ঘটালেন? ইসলামের মহীয়সী নারী হযরত যয়নাবই (আঃ) এরকম বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করে যান। তারপর তার বক্তব্যের শেষাংশে যে ইয়াজিদকে হাজার হাজার মা ষ জাঁহাপনা বলে ডাকতো সেই ইয়াজিদকে ব্যঙ্গ করে হযরত যয়নাব বললেনঃ

يَا يَزِيدُ اِدْ كِيْدَكَ وَاسْعَ سَعْيَكَ نَاصِبْ جَهْدَكَ فَوَاللهِ لَا تَمْحُوا ذِكرَنَا وَ لَا تَمِيتَ وَحْيَنَا

''হে ইয়াযিদ! তোমাদের যে জল্পনা- কল্পনা আর ষড়যন্ত্র আছে সবই করো। তবে জেনে রেখো যে আমাদের স্মরণকে মা ষের অন্তর থেকে কোনিদন মুছে ফলেতে পারবে না। আমাদের এ বাণী চিরন্তন। আর যারা নিশ্চিহ্ন হবে সে হলো তুমি এবং তোমার চাটুকাররা'' (আল লুহুফঃ ৭৭, বিহারুল আনওয়ারঃ ৪৫/২৩৫)

একথা নে ইয়াজিদ প্রথম চুপ রইলো তারপর পাপিষ্ট ইয়াযিদ ভিতরে জ্বলে উঠলো এবং হযরত যয়নাবকে (আঃ) আরও কষ্ট দেয়ার জন্যে তার হাতের লাঠি দিয়ে ইমাম হোসাইনের (আঃ) ছিন্ন মস্তকে খোঁচা মারলো।

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়িল আযিম।

ইমাম হোসাইন এর উপর সর্বশেষ অবিচার -(আঃ)

ইতোমধ্যে আমরা অ ধাবন করতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মতকে রাসূলের (সাঃ) সীরাতে পৌঁছে দেবার মহান লক্ষ্য নিয়ে ইমাম হোসাইন (আঃ) এক অসামান্য বিপ্লব সাধন করেন এবং অনাগতকালের সত্যান্বেষী মা ষের জন্য একটা বাস্তব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, এই ক্ষুরধার চিরন্তন আদর্শকে আমাদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে নানা প্রকার বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ঘটানোর পর। ফলে এ আদর্শ এখন অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে এবং তা থেকে আমরা তেমন কোন উপকার পাচ্ছি না। এ মহান আদর্শের অবকাঠামো এবং লক্ষ্য উভয় ক্ষে ই এমন কিছু রদবদল ঘটানো হয়েছে যাতে কারবালার হত্যাকাণ্ড ধুমা একজন নিরপরাধ ব্যক্তির অহেতুক রক্তপাতের ঘটনা বলেই খাড়া করানো যায়। অবশ্য এ ধরনের বিকৃতি ঘটাতে শত্রু- মি উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। শত্রুরা ইমাম হোসাইনের (আঃ) সাথে বিরোধিতা করবে, তার মহান ব্যক্তিত্বকে ক্ষুন্ন করে মা ষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেননা ইমাম হোসাইনের (আঃ) কারণে তাদের সকল ষড়যন্ত্র এবং কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু মি দের পক্ষ থেকে ইমাম হোসাইনের (আঃ) সাথে এহেন আচরণের কথা নে অনেকের মনে খটকা লাগতে পারে। এ অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করবো। আশা করি একটু মনোযোগ সহকারে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করলে সত্যপ্রিয় ভাই- বোনদের মনের এ খটকা দূর হবে।

কোনো বিষয়কে দু'ভাবে বিভ্রান্ত করা যায়ঃ

এক, বিষয়টির বাহ্যিক অবকাঠামোতে অসংশ্লিষ্ট কিছু যোজন- বিয়োজনের মাধ্যমে।

দুই, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিকৃত ও ভ্রান্ত অর্থে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে।

দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, হোসাইনী মহান আদর্শে এ উভয় ধরনের বিভ্রান্তিই ঘটানো হয়েছে। আমরা প্রথমে কোনো বিষয়ের অবকাঠামোগত এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিভ্রান্ত করাকে দু'টো উদাহরণ সহকারে বোঝাতে চেষ্টা করবো।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যেকানো বিষয়ের বাহ্যিক অবকাঠামোতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করার অর্থ এতে অসংশ্লিষ্ট কোনো কিছুর সংযোজন কিংবা তা থেকে অপিরহার্য কোনো কিছুর বিয়োজন ঘটানো। আমাদের দেশে পল্লী অঞ্চলে একটি হাসির কাহিনী পরিচিত। এক মহাজন এবং তার চাকরকে নিয়েই এ কাহিনী রচিত। কাহিনীর এক পর্যায়ে এসে এক মজাদার ঘটনার অবতারণা হয়। একদিন মহাজন তার অফিসে বসে চাকরের মাধ্যমে বাড়িতে লিখে পাঠালো যে, আজ দুপুরে আমার জন্য মাছ- মাংস রান্না করা হোক, আর আমার চাকরের জন্য ডাল- ভাত। চাকর এ চিঠি নিয়ে মহাজনের বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হলো। কিন্তু চিঠিতে কী লেখা আছে তা জানার বড় কৌতুহল জাগলো তার। এদিকে নিজে আবার পড়া না কিছুই জানে না। পথিমধ্যে একজন শিক্ষিত লোকের সাথে তার দেখা। সে ঐ লোককে চিঠিটা একটু পড়ে শোনাবার অ রোধ করলো। চিঠির বক্তব্য নে চাকর এক ফন্দী করলো এবং ঐ লোককে বললোঃ আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। লোকটি বললোঃ কী ব্যাপার! চাকর বললোঃ ঐ মহাজনের নাম কেটে ওখানে আমার নাম বসিয়ে দিন এবং আমার নামের জায়গায় ওনার নাম । তাই করা হলো। চাকর বাসায় এসে মহাজনের চিঠিটি দিল। বাড়ির লোকেরাও চিঠির বক্তব্য অ যায়ী চাকরের জন্য রান্না করলো মাছ- মাংস আর মহাজনের জন্য ডাল- ভাত। এ হলো কোন বিষয়ের অবকাঠামোগত বিভ্রান্তি । এখানে আমরা দেখলাম যে, বিষয়টিকে বিভ্রান্ত করার জন্য অসংশ্লিষ্ট বা অসত্য একটা কার্য সাধন করে এতে যোজন- বিয়োজন ঘটানো হয়েছে।

কিন্তু কোনো বিষয়কে যখন ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করা হয় তখন তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয় না। পুরো ঘটনাই অবিকল থেকে যাবে। কিন্তু এর অর্থ করার সময় ভুল অর্থ করা হবে। এ সম্পর্কে এক উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। উদাহরণটি একটি সত্য ঘটনা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটি ঘটেছিলো।

মদীনার মসিজদ নির্মাণ করার সময় মুসলমানরা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশহণ করে। হযরত আম্মার ইয়াসির সেদিন অত্যধিক পরিশ্রম করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সময় তাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

يَاعَمَّارُ ! تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

''হে আম্মার! তোমাকে একদল অবাধ্য ও পথভ্রষ্ট লোকজন হত্যা করবে।'' (সীরাতু হালাবীঃ ২/৭৭)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মূলত কোরআনের এই আয়াতটির দিকেই ইঙ্গিত করলেনঃ ''মুমিনদের দুই দল দ্বন্দে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব; অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।'' (সূরা হুজুরাতঃ ৯)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর ঐ কথার পর থেকে মুসলমানরা হযরত আম্মার ইয়াসিরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতো। কারণ, তিনি হক ও বাতিলের প্যারামিটার। তিনি যে দলে থাকবেন তারাই সঠিক পথের অ সারী। আর যারা তাকে হত্যা করবেন তারা অবাধ্য ও পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হবে।

এ ঘটনার প্রয় ৩৫ বছর পর মুসলমানদের দু'দলের মধ্যে সিফফিনের ময়দানে বেজ উঠলো যুদ্ধের দামামা। একদলের নেতা হলেন খলিফা হযরত আলী (আঃ) এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলো কাপুরুষ মুয়াবিয়া। এ সময় হযরত আম্মার ইয়াসির দেখে হযরত আলী (আঃ)- এর বাহিনীতে অনেক দুর্বল ঈমানের লোকও সত্যের পথে নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু অনেকে আবার মোয়াবিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তারা হযরত আম্মার ইয়াসিরের শাহাদাত না দেখা পর্যন্ত হযরত আলীর (আঃ) সঠিক পথে থাকার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলো। মুয়াবিয়ার দ্বারা হযরত আম্মার ইয়াসিরের নিহত হবার ঘটনায় সবাই মোয়াবিয়ার পথভ্রষ্টতা ধরে ফেললো। সাথে সাথে চারদিকে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। এমন কি স্বয়ং মোয়াবিয়ার সৈন্যরাও বললো আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুখে নেছি আম্মারকে হত্যা করবে একদল অবাধ্য এবং পথভ্রষ্ট লোকজন। তারাও তখন মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে মনস্থ

করলো। পরিস্থিতি সামলানোর জন্য মুয়াবিয়া তার চিরকালের স্বভাব অ যায়ী এবারও এক ধোকাবাজির আশ্রয় নিলো। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর এ হাদীস নিজের কানে শোনা বহু মুসলমান তখনও বেঁচে ছিলো তাই মোয়াবিয়া এ হাদীস জাল করার কোনো সাহস পেল না। অর্থাৎ এ হাদীসে হস্তক্ষেপ করে তার অবকাঠামোতে কোনো বিভ্রান্তি ঘটানোর প্রয়াস পেল না।

অগত্যা সে অন্য পথ বেছে নিলো। সে ঘোষণা করলোঃ তোমরা ভুল বুঝেছো। আম্মারকে যারা হত্যা করবে তারা পথভ্রষ্ট এ কথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঠিকই, কিন্তু আম্মারকে তো আমরা হত্যা করিনি। এ কথা নে সবাই আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললোঃ আমরা নিজের হাতেই আম্মারের গলায় তলোয়ার চালালাম আর তুমি বলছো আম্মারকে আমরা হত্যা করিনি! এ কেমন কথা? মোয়াবিয়া বললোঃ হ্যাঁ, আম্মারকে আলীই (আঃ) হত্যা করেছে। আলী (আঃ) যদি আম্মারকে যুদ্ধে না আনতো তাহলে তো আর তিনি নিহত হতেন না। কাজেই আম্মারকে হত্যার জন্য আলীই (আঃ) দায়ী এবং তার দলই পথভ্রষ্ট । গন্ডমূর্খ মুসলমানরা এবারও মুয়াবিয়ার দ্বারা ধোঁকা খেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর হাদীসের এ ধরনের ব্যাখ্যা নেও তারা তা মেনে নিলো।

আমর ইবনে আস ছিলো মোয়াবিয়ার সংগীদের একজন। তার ছিলো দুই ছেলে। তাদের একজন বাবার মতোই চাটুকার। কিন্তু অপর ছেলে ছিলো ঈমানদার এবং বিশ্বস্ত। এ কারণে বাবার সাথেও তার কোনো মিল ছিল না। নাম ছিলো আব্দুল্লাহ। একিদন মুয়াবিয়ার এক জলসায় আব্দুল্লাহও উপস্থিত ছিলো। ঐ জলসায় মুয়াবিয়া পুনরায় হযরত আম্মারকে হত্যার জন্য হযরত আলীকেই (আঃ) দোষারোপ করলো এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর ঐ হাদীসের অপব্যাখ্যা করলো। এ সময় আব্দুল্লাহ প্রতিবাদ করে বলে উঠলোঃ কিসব আবোল- তাবোল বকছেন? আলীর (আঃ) দলে ছিলো বলেই হযরত আম্মারকে হত্যা করেছেন আলী (আঃ)?

মুয়াবিয়া বললোঃ তাছাড়া কী?

আব্দুল্লাহ বললোঃ তাহলে হযরত হামযাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হত্যা করেছেন, তাই তো? (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা হযরত হামযাতো রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর দলে ছিলেন।

মোয়াবিয়া যেন একবারে হাতে- নাতে ধরা পড়লো। উপায়ন্তর না দেখে সে আব্দুল্লাহর বাবাকে ধমক দিয়ে বললোঃ তোমার এ বেয়াদব ছেলেকে চুপ করতে বলো।

যা হোক এ ঘটনায় আমরা দেখলাম যে, মুয়াবিয়া হাদীসটির কোনো রদবদল না করে কেবল এর অর্থ করার সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো এবং তাতেই একটি জ্বলন্ত সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছিলো।

তবে এ ধরনের বিভ্রান্তির ক্ষে দ্বিতীয় পন্থাটি অধিকতর মারাত্মক। কারণ এতে করে কোনো বিষয়ের গভীরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়।

আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম যে, ইমাম হোসাইনের (আঃ) আন্দোলন ছিলো এক অসাধারন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পবি ও মহান আন্দোলন। ইতিহাসে এর কোনো জুড়ি নেই। আর এ কারণেই তা চিরকালের আদর্শে পরিণত হয়েছে। কেননা এর লক্ষ্য কোনো নির্দিষ্ট গো , জাতি, দেশ, মহাপ্রদেশের অনেক উর্ধ্বে ছিলো। সমস্ত মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয় এ আন্দোলন। একত্ববাদ, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, সমতা, সহমর্মিতা এবং এ ধরনের ম ষ্যত্বের জন্য অপরিহার্য হাজারো উপাদানকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষেই পরিচালিত হয় এই আন্দোলন।

এ কারণে তিনি সমস্ত মা ষের। সবাই তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমনটি বলেছেনঃ

حُسَيْنٌ مِنِّي وَ اَنَا مِنْ حُسَيْنٍ

‘‘হোসাইন আমা হতে এবং আমি হোসাইন হতে।’’ (কাশফুল গোম্মাহঃ ২/১০, ৬১ হিল্লিয়াতুল আবরার : ১/৫৬০ মুলহাকাতু এহকাকিল হকঃ ১১/২৬৫- ২৭৯ এ’লামুল ওয়ারাঃ ২১৬ ইরশাদে মুফিদঃ ২৪৯)

তেমনি আমরাও সমস্বরে বলিঃ

حُسَيْنٌ مِنِّي وَ اَنَا مِنْ حُسَيْنٍ

অর্থাৎ ‘‘হোসাইন আমা হতে এবং আমি হোসাইন হতে।’’

কেননা ১৪০০ বছর আগ তিনি আমাদের জন্য এবং মানবতার জন্য বিপ্লব করে গেছেন। তার বিপ্লব পবি ও মহান ছিলো। কোনরকম ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠিস্বার্থের উর্ধ্বে এ বিপ্লব।

ইমাম হোসাইন (আঃ) দূরদর্শী ছিলেন। তিনি যা দেখতেন সমসাময়িক কালের কোনো বুদ্ধিজীবী কিংবা চিন্তাবিদের মাথায়ও তা আসতো না। তিনি মা ষের পরি াণের উপায় তাদের নিজেদের চেয়ে ভালো বুঝতেন। দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, শত বছর যখন পার হয় তখন মা ষ একটু একটু বুঝতে পারে যে, সত্যিই তো! তিনি তো এক মহাবিপ্লব করে গেছেন। আজ আমরা পরিস্কার বুঝতে পারি যে, ইয়াযিদ কি ছিলো আর মোয়াবিয়া কি ছিলো বা উমাইয়াদের ষড়যন্ত্র কি ছিলো। কিন্তু ইমাম হোসাইন (আঃ) সেদিনই এর চেয়ে ভালো বুঝতে পেরেছিলেন। সেকালে বিশেষ করে অ ন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে মদীনার লোকজন ইমাম হোসাইন (আঃ) কি চান তা অ ধাবন করতে পারেনি। কিন্তু ইমাম হোসাইনের (আঃ) নিহত হবার সংবাদ যেদিন তাদের কানে গেলো, অমনি যেন সবার টনক নড়ে উঠলো। সবার একই প্রশ্নঃ হোসাইন ইবনে আলীকে (আঃ) হত্যা করা হলো কেন? এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য মদীনার চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এর প্রধান ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা। তদন্ত কমিটি শামে গিয়ে ইয়াযিদের দরবারে এসে উপস্থিত হলো। মা ক'দিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই তারা অবস্থাটি ধরে ফেললো। অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তারা শীঘ্রই মদীনায় ফিরে এলো। লোকজন জিজ্ঞেস করলো কী দেখে এলেন? জবাবে তারা বললোঃ ধু এইটুকুই তোমাদের বলি যে, আমরা যে ক'দিন শামে ছিলাম সে ক'দিন ধু এ চিন্তায় ছিলাম যে, খোদা এক্ষুণি হয়তো এ জাতিকে পাথর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করবেন! লোকজন বললোঃ কেন, কী হয়েছে? তারা বললোঃ আমরা এমন এক খলিফার সামনে গিয়েছলাম যে প্রকাশ্যে মদ খাচ্ছিলো, জুয়া খেলছিল, কুকুর- বানর নিয়ে খেলা করছিলো, এমন কি বেগানা নারীর সাথে যেনাও করছিলো!

আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালার আটজন ছেলে ছিলো। তিনি মদীনার জনগণকে বললেনঃ তোমরা বিদ্রোহ কর আর না করো আমি ধু আমার আটজন ছেলেকে নিয়ে হলেও বিদ্রোহ করতে যাচ্ছি । কথামতো তিনি তার আটজন ছেলেকে নিয়ে বিদ্রোহ করলেন এবং ইয়াযিদের বিরুদ্ধে ''হাররা

বিদ্রোহে'' প্রথম তার আটজন ছেলের সবাই এবং পরে তিনি নিজেও শহীদ হন। (মুরুজুয যেহাব ৩/৬৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা নিঃসন্দেহে একজন চিন্তাশীল লোক ছিলেন। কিন্তু তিন বছর আগে ইমাম হোসাইন (আঃ) যখন মদীনা থেকে বেরিয়ে আসনে তখন তিনিও ইমামের (আঃ) কাজকর্ম থেকে কিছুই বুঝতে পারেননি।

ইমাম হোসাইন (আঃ) বিদ্রোহ করলেন, আন্দোলন করলেন, জানমাল উৎসর্গ করলেন। তিন বছর কেটে গেলো। তারপর আজ এসে আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালার মতো ব্যক্তিরও টনক নড়লো। এ হলো ইমাম হোসাইনের (আঃ) দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার স্বরূপ মা ।

ইমাম হোসাইন (আঃ) এত বড় মহান এক আন্দোলন করে গেলেন। চিরকালীন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। সর্বকালের সত্যান্বেষী মা ষ এ আদর্শ থেকে শিক্ষা নেবে, অ প্রেরণা এবং নির্দেশনা নিয়ে অন্যায় এবং অসত্যের মূল উপড়ে ফেলবে। তার আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মা ষ যাতে বিতর্কে না পড়ে এ জন্য সেই প্রথম দিনেই তিনি তা ঘোষণা করে দিলেন। অথচ দুঃখের বিষয় হলো যে, আমাদের কাছে এসে এ আন্দোলনের চেহারা পাল্টে গেছে। এ আন্দোলন সম্পর্কে এমনসব বিভ্রান্তিকর তথ্য ও ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে যে, এর তেজ এখন আর নেই। উপরন্তু এসব ব্যাখ্যা আজ যেন মা ষের পাপ বাড়ানোর উসিলা হয়েছে। হয়তো কথাটি একটু খটকা লাগছে। তবুও অপ্রিয় এ সত্য কথা না বলে পারছি না। এখানে হোসাইনী আন্দোলনের আত্মায় বিভ্রান্তিকর অর্থ ঢোকানোর দুটো নমুনা উল্লেখ করা হলোঃ

প্রথমত, বলা হয় যে, ইমাম হোসাইন (আঃ) শহীদ হলেন যাতে উম্মতের সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়। এক আজব ব্যাখ্যা!

জানি না মুসলমানরা এ ব্যাখ্যা খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে পেয়েছে কি- না? খ্রীষ্টানরা এ ধরনের ব্যাখ্যায় ওস্তাদ। মুসলমানরা তেমনি খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে অনেক কিছুই ধার করেছে যা ইসলামের পরিপন্থি।

খ্রীষ্টানদের আকীদার একটি মূল অংশ এই যে, তারা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হন খ্রীষ্টানদের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেবার জন্য । অর্থাৎ এখন থেকে খ্রীষ্টানরা যতই পাপ করুক, কোনো ভয় নেই। কেননা হযরত ঈসা (আঃ) আছেন। উম্মতের সব পাপ তার কাঁধেই পড়বে। এ কারণে আজ খ্রীষ্ট সমাজে যত অনাচার, নৈরাজ্য, ব্যভিচার, হত্যা, লুন্ঠন অবাধে চলছে।

জানি না আমরা মুসলমানরা যে বলি ইমাম হোসাইন (আঃ) নিহত হয়েছেন উম্মতের সমস্ত পাপ নিজের কাঁধে তুলে নেবার জন্য, এ বিশ্বাসটাও খ্রীষ্টানদের থেকে আমদানী করা কি- না। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, ইমাম হোসাইন (আঃ) উম্মতের জন্য এক 'পাপের বীমা' খুলেছেন। যে ব্যক্তি এ বীমায় নাম লেখাবে তার আর কোন ভয় নেই। নির্ভয়ে পাপ করে যাক, হত্যা, লুন্ঠন, অত্যাচার, ব্যাভিচার যা পারে করুক। সবকিছুর জন্যই ইমাম হোসাইন (আঃ) আছেন। তিনিই বাঁচাবেন। (নাউযুবিল্লাহ)।

এটি ইমাম হোসাইনের (আঃ) উপর কত বড় এক অবিচার তা আমরা একটুও ভেবে দেখিনি। আমরা হোসাইনী আন্দোলনের এমন এক ব্যাখ্যা করলাম যা ইমাম হোসাইনের (আঃ) লক্ষ্যের যেমন সম্পূর্ণ পরিপন্থি তেমনি তা স্বয়ং ইমাম হোসাইনের (আঃ) মহাত্মার জন্যও অবমাননাকর।

ইমাম হোসাইন (আঃ) চেয়েছেন ইয়াযিদ, শিমার, ইবনে সা'দ, ইবনে যিয়াদদের গোড়া কর্তন করতে। আর আমরা বলি, একটা ইয়াযিদ, একটা শিমার, একটা ইবনে যিয়াদ, একটা ইবনে সা'দ কম ছিলো। ইমাম হোসাইন (আঃ) নিজের জানমাল বিসর্জন দিলেন যাতে উম্মত অবাধে পাপ করতে পারে এবং দুনিয়াতে আরও ক'জন ইয়াযিদ, আরও ক'জন শিমার, আরও ক'জন ইবনে সা'দের জন্ম হয়! যেন ইমাম হোসাইন (আঃ) বললেনঃ হে ভাইসকলঃ যা ইচ্ছে তাই করো, আমি তোমাদের পাপের বীমা হলাম। তোমরা চেষ্টা কর যাতে ইয়াযিদ হতে পারো, শিমার হতে পারো, (নাউযুবিল্লাহ)।

এ হলো মি দের হাতে ইমাম হোসাইনের (আঃ) অসহায় হবার এক উদাহরণ। ইমাম হোসাইনের (আঃ) মহান আদর্শের মহান উদ্দেশ্যকে আমরা একেবারে ১৮০ ডিগ্রী বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে এটিকে ভোঁতা করে দিয়েছি, এটিকে পাপী তৈরীর আন্দোলনে পরিণত করেছি।

দ্বিতীয় যে ভ্রষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে হোসাইনী আদর্শকে অসার ও প্রভাবহীন করে দেয়া হয়েছে তা হলোঃ আরেকটি দল মুসলমান বলে থাকে ইমাম হোসাইন (আঃ) বিদ্রোহ করে নিহত হলেন এটি ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর ভাগ্য লেখা ছিলো। তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যাস, এ নিয়ে আপনার আমার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। অর্থাৎ হোসাইনী আদর্শ অ করণ করার কোনো যুক্তি নেই এবং ইমাম হোসাইনের (আঃ) সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকতে হবে এরও কোনো আবশ্যকতা নেই। কেননা এটি ইসলামের মূল করণীয় বিষয়গুলোর অন্তর্ভূক্ত নয়।

একবার ভেবে দেখুন যে, হযরত ইমাম হোসাইনের (আঃ) কথার সাথে আমাদের কথার কত ক্রোশ ব্যবধান? ইমাম হোসাইন (আঃ) চিৎকার করে বললেন যে, আমার বিদ্রোহের কারণ ইসলামের মৌলিক ও সার্বিক বিষয়াদির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আর আমরা বলছি এটি একটি বিশেষ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এ নিয়ে মাতামাতি করার কোনো দরকার নেই।

ব্যক্তিগত কর্তব্য তাকেই বলা যায় যার সাথে সার্বজনীন করণীয় কোনো বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা থাকে না। অথচ আমরা সবাই ভালভাবে জানি এবং ইমাম হোসাইন (আঃ) নিজেও বলেছেন যে, ইসলাম কোনো মুমিনকে জুলুম, অত্যাচার, সামাজিক অধঃপত প্রভৃতির প্রেক্ষিতে নাকে তেল ঢেলে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর অ মতি দেয় না। ইমাম হোসাইনের (আঃ) আদর্শ ছিলো ইসলামী আদর্শেরই এক বাস্তব প্রতিফলন। হোসাইনী আদর্শ ইসলাম বহির্ভূত পৃথক কোনো আদর্শ নয়। ইসলাম যা বলেছে ইমাম হোসাইন (আঃ) তার বাস্তবায়ন করেছেন। কিন্তু আমরা হোসাইনী আন্দোলনকে এক অ করণীয় আদর্শ হবার অ পযুক্ত করে দিয়েছি। আর যখনই এটি আদর্শ হবার অ পযুক্ত হয়ে গেলো তখন এর আ করণ করারও প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। অর্থাৎ ইমাম হোসাইনের (আঃ) আন্দোলনে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছুই নেই। এভাবে আমরা হোসাইনী আন্দোলনকে এক অ করণীয় আদর্শ হবার অ পযুক্ত করে দিয়েছি। আর যখনই এ

আদর্শ হবার অ পযুক্ত হয়ে গেলো তখন এর আ করণ করারও প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। অর্থাৎ ইমাম হোসাইনের (আঃ) আন্দোলনে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় কিছুই নেই। এভাবে আমরা হোসাইনী আন্দোলনকে মূল্যহীন এক ঘটনায় পরিণত করেছি। আর এ ছিলো ইমাম হোসাইনের (আঃ) উপর চালিত সর্বশেষ জুলুম যা মি দের পক্ষ থেকেই তার উপর চালানো হয়।

অনেকে আবার এই বলে চোখের পানি ঝরাতে থাকে যে, নবীর (সাঃ) সন্তান ইমাম হোসাইনকে (আঃ) বিনা দোষে হত্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা বোঝাতে চায় যে ইমাম হোসাইন (আঃ) নির্দোষ ছিলেন তবে দুঃখ হলো যে তাকে মজলুম অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। ধু এটিই তাদের আফসোস। অনর্থক তার রক্ত ধুলায় মেখেছে। তারা চোখের পানি দিয়ে যেন হযরত ফাতেমাকে (আঃ) সান্তনা দিতে চায়। এর চেয়ে বোকামি আর কী আছে?

পৃথিবীতে যদি কোনো একজন লোক তার রক্তের প্রতিটি ফোটাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য দান করে থাকেন তাহলে তা একমা ইমাম হোসাইন (আঃ) পেরেছেন। সেই ৬১ হিজরী থেকে আজ ১৪১৫ হিজরী পর্যন্ত ইমাম হোসাইনের (আঃ) নামে যত টাকা- পয়সা খরচ করা হয়েছে তা যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে তার প্রতি ফোটা রক্তের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। যে ব্যক্তির নাম সর্বযুগের স্বৈরাচার ও অত্যাচারী শাসকের রাজ প্রাসাদ নড়বড়ে করে দিয়েছে তিনি কি বৃথা নিহত হলেন!

তাই আমরা যারা আফসোস করে বলি যে, মজলুম ইমাম হোসাইন (আঃ) অকারণে নিহত হয়েছেন তাদের জানা উচিত যেঃ

حُسَيْنٌ مِنِّي وَ اَنَا مِنْ حُسَيْنٍ

ইমাম হোসাইনের (আঃ) মাকামে একমা শাহাদাতের মাধ্যমেই পৌঁছানো সম্ভব। তিনি শ্রেষ্ঠ মাকামের অধিকারী। তাই আমাদের তার নিহত হওয়ার শোকে মূর্ছিত হবার কোনো যুক্তিই নেই। আফসোসই যদি করতে হয় তাহলে আমাদের নিজেদের জন্য করা উচিত। আমাদের এ উদ্দেশ্যে চোখের পানি ঝরানো উচিত যাতে ইমাম হোসাইনের (আঃ) ঈমান, দৃঢ়তা, সত্য ও

ন্যায়পরায়ণতা, মুক্তি কামিতা, সৎসাহস, বীরত্ব, তাকওয়া প্রভৃতির সাগর থেকে এক বিন্দু হলেও যেন আমাদের ভাগ্যে জোটে।

হোসাইনী আদর্শ হুবহু টিকিয়ে রাখার জন্য এতো তাকিদ করার কারণও হলো এটিই। আমরা যদি হোসাইনী আত্মার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারি, ইমাম হোসাইনের (আঃ) ঈমান, একত্ববাদ, মুক্তি কামিতা, তাকওয়া, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে আমরা যদি সামান্যটুকুও লাভের আশায় চোখের পানি ঝরাতে পারি তাহলে এ চোখের পানির মূল্য অপরিসীম। এ অশ্রু একটি মাছির পাখনার সমান সূক্ষ্ম হলেও তার মূল্য কেউ দিতে পারবে না। ইমাম হোসাইন (আঃ) আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই আদর্শের খাঁটি অ সারী হবার আশায় কাঁদলে সে কান্নারও মূল্য আছে।

হোসাইনী আদর্শকে টিকিয়ে রাখতে উপর্যুপরি তাকিদ করা হয়েছে যাতে মা ষ ইসলামের এই বাস্তব চেহারাকে সরাসরি দেখতে পারে। মা ষ নবী (সাঃ) বংশের এই ঈমান দেখে নবীর (সাঃ) নবুয়্যতকে সত্য বলে বুঝতে পারবে। কেউ যদি অসীম বীরত্ব ও ঈমানের পরিচয় দিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হয় তবুও এটি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) রিসালাতের সত্যতার জন্য তেমন কোনো দলিল হতে পারে না। কিন্তু নবীর (সাঃ) সন্তান হযরত ইমাম হোসাইনকে (আঃ) ঐ অসীম ঈমান, সাহস, বীরত্ব, তৌহিদী অবস্থায় শহীদ হতে দেখে যে কেউই রাসূলুল্লাহর (সাঃ) রিসালাতের সত্যতা অ ধাবন করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর কোনো লোক হযরত আলীর (আঃ) চেয়ে বেশী সময় রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সান্নিধ্য পায়নি। রাসূলের (আঃ) ঘরেই তিনি বড় হন। তাকে দেখে মা ষ যেমন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) রেসালাতের সত্যতাকে অ ধাবন করতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) আদর্শে অ প্রাণিত হয়ে রাসূলের (সাঃ) সন্তানকেই যখন অসীম ঈমান ও বিশ্বস্ততার সাথে দেখে তখনও মা ষ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) রিসালাতের সত্যতা অ ধাবন করতে পারে। কেননা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) তাজাল্লী ইমাম হোসাইনের (আঃ) মধ্যে দেখা যায়। মুসলমানরা ঈমান শব্দটি কতই নেছে কিন্তু বাস্তবে কমই দেখেছ। ইমাম হোসাইনের (আঃ) দিকে তাকালেই এই ঈমানের প্রতিফলন দেখতে পায়। মা ষ অবাক হয়ে বলতে বাধ্য হয়

যে, মা ষ কোথায় পৌঁছতে পারে!! মা ষের আত্মা এত পরিমাণ অভঙ্গুর হতে পারে!! তার দেহকে খণ্ড - বিখণ্ড করা হয়, যুবক পু কে তার চোখের সামনে ছিন্ন- ভিন্ন করা হয়, তৃ ার চোটে আকাশের দিকে চেয়ে যার চোখ অন্ধকার হয়ে আসে, পরিবার- পরিজনদেরকে একই শিকলে বেঁধে বন্দী করা হয়, সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হন। কিন্তু ধু মা যে জিনিস অক্ষয় হয়ে রয়ে গেছে তা হলো ইমাম হোসাইনের (আঃ) আত্মা। এ আত্মার কোনো ধ্বংস নেই।

পৃথিবীতে আর মা একটি ঘটনা খুজে বের করুন যাতে সমস্ত মানিবক গুণাবলী পুঙ্খা পুঙ্খভাবে রক্ষিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। কারবালা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ঘটনায় যদি তা পাওয়া যেত তাহলে আমরা এখন থেকে কারবালার ঘটনাকে রেখে সেটাকেই স্মরণ করবো। কোথাও পাবেন না।

তরাং কারবালার মতো ঘটনাকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে যে ঘটনায় আত্মিক ও মানিসক উভয় দিক দিয়ে মা ৭২ জনের এক বাহিনী ি শ হাজার লোকের বাহিনীকে পরাজিত করেছে। তারা সংখ্যায় মা ৭২ জন ছিলেন এবং মৃত্যু যে নির্ঘাত এটিও তারা নিশ্চিতভাবে জানতেন। তবুও কিভাবে তারা ি শ হাজারের বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন?

প্রথমত তারা এমন শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন যে, শত্রুদের থেকে হুর ইবনে ইয়াযিদ রিয়াহীর মতো ি শ জনের অধিক লোককে বেঁচে থাকার ঘাঁটি থেকে নির্ঘাত মৃত্যুর ঘাঁটিতে আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। কিন্তু মৃত্যু ঘাঁটি থেকে একজন লোকও ইয়াযিদের দুনিয়াবি ঘাঁটিতে যায়নি। তাহলে বুঝতে হবে যে, এ ঘাঁটিতে সংখ্যা কম এবং নিশ্চিত হলেও এখানে শক্তি - সামর্থ অনেক বেশী যা দিয়ে শত্রুদেরকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়ত আরবের চিরাচরিত নিয়মা যায়ী একজনের মোকাবিলায় অন্য আরেকজন যুদ্ধ করতো। কারবালায় ইবনে সা'দ প্রথমে এভাবেই যুদ্ধ করতো রাজি হয়। কিন্তু যখন দেখলো যে, এভাবে যুদ্ধ করলে ইমাম হোসাইনের (আঃ) একজন সৈন্যই তার সমস্ত সৈন্যকে সাবাড় করে দিতে যথেষ্ট তখন সে এ যুদ্ধ বর্জন করে দল বেঁধে আক্রমণ করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হলো।

আ রার দিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একে একে ৭১ জন শহীদের লাশকে ইমাম হোসাইন কাঁধে বয়ে তাঁবুতে নিয়ে এসেছেন। তাদের কাছে গিয়ে অভয় বাণী দিয়েছেন, তাঁবুতে এসে সবাইকে শান্ত করেছেন, এছাড়া তিনি নিজেও কত দুঃখ- কষ্ট সহ্য করেছেন। ৫৭ বছরের একজন বৃদ্ধলোক এত ক্লান্ত, শ্রান্ত অবস্থায় যখন ময়দানে এলেন তখন শত্রুরা ভেবেছিলো হয়তো সহজেই তাকে পরাস্ত করা যাবে। কিন্তু একটু পরেই তাদের সব আশা- ভরসা উড়ে গেলো। ইমাম হোসাইনের (আঃ) সামনে যে- ই এলো এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারলো না। ইবনে সাদ এ অবস্থা দেখে চিৎকার করে বলে উঠেঃ

هَذَا ابْنُ قَتَّالِ الْعَرَبِ

''তোমরা জান এ কার সন্তান? এ তারই সন্তান যে সমস্ত আরবকে নিশ্চিহ্ন করতে পারতো। এ শেরে খোদা আলীর (আঃ) সন্তান।'' (মাকতালু মোকাররমঃ ৩৪৬ বিহারুল আনওয়ারঃ ৪৫/৫৯ মানাকিবে ইবনে শাহের অ বঃ ৪/১১০)

وَاللهِ نَفْسُ اَبِيهِ بَيْنَ جَنْبَيْهِ

তারপর বলে : ''আল্লাহর শপথ করে বলছি, তার দু'বাহুতে তার বাবার মতোই শক্তি । আজ যে তার মোকাবিলায় যাবে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'' এটি কি ইবনে সা'দের পরাজয়ের প্রমাণ নয়? ি শ হাজার সেনা নিয়ে যে একজন ক্লান্তশ্রান্ত, বয়োবৃদ্ধ, অপরিমেয় দুঃখ- কষ্টে জর্জরিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পশ্চাদপসরণ করে ছুটে পালায় এটি কি তাদের পরাজয় নয়? (ইরশাদে মুফিদঃ ২৩০ বিহারুল আনওয়ারঃ ৪৪/৩৯০)

তারা তলোয়ারের মুখে যেমন পরাজয় বরণ করে তেমনি ইমাম হোসাইনের (আঃ) চিন্তাধারার কাছেও তাদের হীন চিন্তাধারা পরাজিত হয়।

আ রার দিন যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ইমাম হোসাইন (আঃ) - তিনবার বক্তৃতা দান করেন। এ বক্তৃতাগুলো প্রত্যেকটি বীরত্বপূর্ণ ছিলো। যাদের বক্তৃতা করার অভ্যাস আছে তারা হয়তো জানেন যে বক্তৃতার ধরন অ যায়ী উপযুক্ত মানসিকতার দরকার হয়। সাধারণ অবস্থায় মা ষ একটি

অসাধারণ বক্তব্য রাখতে পারে না। যে হৃদয় আঘাত পেয়েছে সে ভালো মার্সিয়া পড়তে পারে। যার হৃদয় প্রেমে ভরা সে ভালো গজল গাইেত পারে। তেমনি কেউ যদি বীরত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করতে চায় তাহলে তার অস্তিত্ব বীরের ভাবা ভবে ভরা থাকতে হবে। ইমাম হোসাইন (আঃ) আ রার দিনে যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন তখন ইবনে সা'দ চিন্তায় পড়ে গেল। সবার কানে যাতে ইমামের কথা পৌঁছায় সে জন্য ইমাম হোসাইন (আঃ) একটি উচু জায়গা হিসাবে উটের পিঠে উঠে দাঁড়ালেন এবং চিৎকার করে বললেনঃ

تَبّاً لَكُمْ اَيَّتُهَا الْجَمَاعَة وَ تَرْحاً حيْنَ اسْتَصْرَخْتُمُونَا وَالِهِين فَاَصْرَخْنَاكُمْ مُوجِفِينَ

''হে জনগোষ্ঠি! তোমাদের জন্য ধ্বংস এ জন্য যে, তোমরা জটিল পরিস্থিতিতে আমার সাহায্য চেয়েছো। আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি। কিন্তু যে তরবারী আমার সাহায্যে পরিচালনার শপথ তোমরা নিয়েছিলে আজ আমাকে হত্যার জন্য সে তরবারী হাতে নিয়েছো।'' (আল- লুহুফঃ ৪১ তুহফাল উকুলঃ ১৭৩ মানাকিবে ইবনে শাহরে অ বঃ ৪/১১০ মাকতালু মোকাররামঃ ২৮৬/৬)

সত্যিকার অর্থে হযরত আলীর (আঃ) জ্ঞানগর্ভমূলক বাগ্মিতার পর এ ধরনের বক্তৃতা আর খুজে পাওয়া যায় না। ইমাম হোসাইনের (আঃ) বক্তৃতায় যেন হযরত আলীরই (আঃ) বিচক্ষণতা। যেন সেই জ্ঞান, সেই সাহস, সেই বীরত্ব । ইমাম হোসাইন (আঃ) এ কথা তিনবার চিৎকার করে বললেন। তাতেই ইবনে সাদের মনে ভয় ঢুকে গেলো যে, এভাবে কথা বলতে দিলে এক্ষুণি তার বাহিনী ছ ভঙ্গ হয়ে পড়বে। তাই ইমাম হোসাইন (আঃ) যখন চতুর্থ বারের মত কথা বলতে যাবেন এ সময় পরাজিত মনোবৃত্তি নিয়ে কাপুরুষ ইবনে সাদ নির্দেশ দিল যে, সবাই হৈ- হুল্লোড় করে উঠবে যাতে ইমাম হোসাইনের (আঃ) কথা কেউ নতে না পারে। এটি কি পরাজয় নয়? এটি কি ইমাম হোসাইনের (আঃ) বিজয় নয়?

মা ষ যদি ঈমানদার হয়, একত্ববাদী হয়, যদি আল্লাহর সাথে নিগুঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেত পারে এবং পরকালে বিশ্বাসী হয় তাহলে একাই বিশ- ি শ হাজার সজ্জিত সৈন্যকে মানসিকভাবে পরাস্ত করতে পারে। এটি কি আমাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় নয়? এরূপ উদাহরণ আপনি

দ্বিতীয়টি পাবেন কোথায়? পৃথিবীতে একজন লোক কুজে বের করুন, যে ইমাম হোসাইনের (আঃ) মত দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে পড়েও মা দুটো শব্দ ইমাম হোসাইনের (আঃ) মতো বলতে পারে।

হোসাইনী আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্য এত তাকিদ করার কারণ হলো যে আমরা এটিকে সঠিক ভাবে বুঝবো, এর অনাবিস্কৃত রহস্যগুলো উদ্ধার করবো এবং তা থেকে শিক্ষা নেব। আমরা যাতে ইমাম হোসাইনের (আঃ) মহত্বকে অ ধাবন করতে পারি এবং যদি দু'ফোটা চোখের পানি ঝরাই তা যেন সম্পূর্ণ মারেফাত সহকারে এবং জেনে নে ঝরাতে পারি। ইমাম হোসাইনের (আঃ) পরিচিতি আমাদেরকে উন্নত করে, আমাদেরকে মা ষ করে গড়ে তোলে, আমাদেরকে মুক্তি দান করে। আমাদেরকে সত্য, হকিকত এবং ন্যায়ের শিবিরে নিয়ে যায় এবং একজন খাঁটি মুসলমান তৈরী করে দেয়। হোসাইনী আদর্শ মা ষ গড়ার আদর্শ, পাপী তৈরী করার আদর্শ নয়। হোসাইনের (আঃ) শিবিরি সৎ কর্মীর শিবিরি, পাপীদের এখানে কোন আশ্রয় নেই।

ইতিহাসে আছে, আ রার দিন ভোর বেলায় ইমাম হোসাইন নামাজ সেরে তার সঙ্গী- সাথীদেরকে বললেন, তৈরী হয়ে যাও। মৃত্যু এ দুনিয়া থেকে ঐ দুনিয়ার পার হবার জন্য একটা সাকো বৈ কিছুই নয়। একটা কঠিন দুনিয়া থেকে তামাদেরকে একটা মর্যাদাশালী মহান জগতে পার করে দেব। এ ছিলো ইমাম হোসাইনের (আঃ) বক্তব্য । এ ঘটনাটি ইমাম হোসাইন (আঃ) বর্ণনা করেননি। কারবালায় যারা উপস্থিত ছিলো তারাই বর্ণনা করেছে। এমন কি ইবনে সা'দের বিশিষ্ট রিপোর্টার হেলাল ইবনে নাফেও এ ঘটনা বর্ণনা করেছে যে, আমি হোসাইন ইবনে আলীকে (আঃ) দেখে অবাক হয়ে যাই। তার শেষ মুহূর্ত যতই ঘনিয়ে আসছিলো এবং যতই তার কষ্ট অসহনীয় হয়ে উঠছিলো ততই তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলো । যেন দীর্ঘ বিরহের পর কারো তার আপনজনের সাথে মিলনের সময় হয়েছে। আরও বলে যেঃ

لَقَدْ شَغَلَنِي نُورُ وَجْهِهِ جَمَال هَيْبَتِهِ عَنِ الْفِكْرَةِ فِي قَتْلِهِ

এমনকি যখন অভিশপ্ত শিমার ইমাম হোসাইনের শিরচ্ছেদ করছিলো তখন আমি তার চেহারায় এমন প্রসন্নতা এবং উজ্জ্বলতা দেখেছিলাম যে তাকে হত্যা করার কথা একবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। (আল লুহুফঃ ৫৩, বিহারুল আনওয়ারঃ ৪৫/৫৭)

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের পূর্ব শর্তাবলী -

এ পর্যন্ত আলোচনায় ইমাম হোসাইনের (আঃ) সেই কালজয়ী বিপ্লবে আমরা মোটামুটি তিনটি প্রধান কারণের সন্ধান পেলাম। এ কারণগুলোর প্রতিটির নিজস্ব মূল্যমান হিসেবে হোসাইনী বিপ্লবও ভিন্ন ভিন্ন মা ায় মূল্যায়িত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় তৃতীয় যে কারণটি অর্থাৎ আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের উদ্দেশ্যেই ইমামের (আঃ) বিপ্লবকে সর্বোচ্চ মূল্যে পাঁছে দিয়েছে এবং সর্বাধিক গুরুত্ববহ করে তুলেছে। কেননা আগের দু'টি সাধারণ কারণের বাইরে ইমাম হোসাইন (আঃ) এমন একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিপ্লবের ঘোষণা দিলেন যেখানে তিনিই হলেন একচ্ছ প্রতিবাদী নেতা। এখানে অগ্রনেতা তিনিই, যিনি এগিয়ে এসে সমস্ত অন্যায়, অসত্য আর অ ন্দরের গতিরোধ করে দিলেন। সর্বোপরি, তার ভাষায় হালালকে হারাম করা আর হারামকে হালাল করার ঘৃণ্য চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিলেন। আর এ কারণেই এ বিপ্লব লাভ করেছে নতুন ধারা। অন্যায় বাঁধন ছিন্ন করে যুগ- যুগান্তরের ইতিহাসের কপালের মণি হয়ে জ্বলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ বিপ্লবের বাণী চিরঅমর, চিরঅক্ষয়।

তাই, আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার সম্পর্কে এ পর্যায়ে আমরা একটু তলিয়ে দেখব যে, আসলে এর অবস্থান কোথায়। কোন বিশেষ শক্তিগুণে এটি বলীয়ান হল যে, একজন হোসাইন ইবনে আলী (আঃ) তার জন্যে শির দিয়ে দেবেন? আপনার বুকের রক্ত দিয়ে, স্বজন প্রিয়জনদের কোরবানি করে ইতিহাস উর্ধ্বে এক মহান শোকগাঁথা রচনা করবেন? আর- দীর্ঘ বারশ' বছর অতিক্রান্ত হবার পর আজ আমরা সেই ইমামের (আঃ) স্মরণে বলিঃ

اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلوة و آتَيْتَ الزَّاَاة وَ اَمَرْتَ بِالْمَعْرُوف وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجَاهَدْتَ فِي الله حقَّ جِهَادِهِ حَتَّي اَتيكَ الْيَقينُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নামায কায়েম করেছেন, আপনি সর্বপ্রকার দান- খয়রাতও যথাযথভাবে প্রদান করেছেন। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সৎকাজে উপদেশদাতা আর মন্দ কাজে বাধা

দানকারী ছিলেন। ভাল কাজে মা ষকে উৎসাহিত করেছেন আর মন্দ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত করেছেন অর্থাৎ আপনার এ বিপ্লবের সবটাই ছিল আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের জন্যে ।

وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

আপনি আল্লাহর পথে সেই মা ায় চেষ্টা- প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যা বান্দা হিসাবে প্রভূর রাস্তায় একজন মা ষের করা উচিত।

- এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হল যে, আমরা কখন সাক্ষ্য দিয়ে থাকি? সচরাচর দেখা যায় যে, বিচারকের সামনে বাদী পক্ষ যখন অস্পষ্ট কোনো দাবিকে প্রমাণ করতে চায় তখন সাক্ষীর আশ্রয় নেয়। হয়তো বাদীর পক্ষ নিয়ে বললঃ জনাব বিচারক! আমি অমুক ক্ষণে এই এই শর্তে বিবাদীকে বাদীর কাছ থেকে টাকা ধার নিতে দেখেছি। তরাং বাদী পক্ষের দাবী সত্য।

কিন্তু, ইমাম হোসাইনের (আঃ) সামনে আমাদের এ সাক্ষের অর্থ কী? কার কাছে আমাদের এ সাক্ষ্য আর কার সপক্ষেই বা এ সাক্ষ্য ?

বিজ্ঞ আলেমগণ এ সাক্ষ্যের একটি ন্দর ও অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মা ষ সময় সময় বেশ কিছু বক্তব্য উচ্চারণ করে যা দিয়ে তার উদ্দেশ্য শ্রোতার কাছে নতুন তথ্য জানানো নয়। বরং তার উদ্দেশ্য হল শ্রোতাকে এটি বোঝানো যে, আমিও (বক্তা) এটি বুঝতে পেরেছি বা বুঝি। এ রীতির প্রচলন খুবই সাধারণ। এসব ক্ষে বক্তার বক্তব্য ভালভাবেই অবগত আছে। তাকে আর এ বিষয়ে বোঝাতে যাওয়া অবান্তর। কিন্তু বক্তা যে এটিকে একটি সাক্ষ্য হিসাবে সেই শ্রোতার কাছে পেশ করছে এখানে তার উদ্দেশ্য হল শ্রোতাকে বোঝানো যে, আপনার মতো আমিও বিষয় এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি।

এখানে সাক্ষ্য অর্থাৎ স্বীকারোক্তি । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অর্থাৎ অন্যান্য সমঝদার ও চিন্তাশীলদের মতো আমিও এ সত্য অ ধাবন করতে পেরেছি যে, হে ইমাম (আঃ)! আপনার বিপ্লব ছিল আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের বিপ্লব। কুফাবাসীদের আহবানই আপনার বিপ্লবের মূল ইন্ধন ছিল না কিংবা ইয়াযিদী আ গত্য স্বীকারের চাপও আপনাকে এ বিপ্লবের মূল অ প্রেরণা

দেয়নি বরং এগুলোর অতিরিক্ত কিছু ছিল যা আপনার এ বিপ্লবের মূল অ ঘটক। আপনি ইসলামের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি কে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এ ভিত্তি হল 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার।'

আমরা যদি নবী- আউলিয়া ও মুমিনদের হাতে সংঘটিত বিপ্লবগুলোর সাথে অন্য কোনো সাধারণ জননেতার বিপ্লবকে তুলনা করি তাহলে তার মধ্যে একটি মৌলিক ব্যবধান চোখে পড়ে। এই ব্যবধান কিসের ব্যবধান?

মা ষের যেমন একটি দেহ ও একটি মাথা আছে, মানব কর্মেরও তেমনি একটি দেহ আছে আর আছে একটি আত্মা। কোনো কাজকে হয়তো আমি আর আপনি একইভাবে ও একই পরিমাপে সম্পন্ন করতে পারি। কিন্তু এ কাজ করতে আমাদের মধ্যে যে সমতা ও মিল ছিল সেটি কিসের ভিত্তিতে? মিল এখানেই যে, আমার কাজের দেহ আর আপনার কাজের দেহ ছিল একই ধরনের, একই মাপের ও একই মানের। উভয়ই হয়তো নামায পড়ি, আমিও চার রাকাআত পড়লাম, আপনিও চার রাকাআত, কোন ভাল কাজে আমি একশ' টাকা দান করলাম আপনিও সেই একশ'। এখানে আমাদের কাজের দৈহিক আকার- প্রকৃতিতে কিন্তু তফাৎ নেই। উভয়ের কাজই একনিষ্ঠতা, বিনয়, নেক নিয়ত- এমন কোনো পরম একাত্মতা, প্রেম ও উ আন্তরিকতার সাথে একাজে মনোনিবেশ করেছিলেন যা আমি পারিনি। তাই এখানে এসে কিন্তু অমিলের পালা, আমার আর আপনার সেই একই কাজ এখানে এসে আর একই মূল্যের, একই মানের রইলো না। আপনার কাজের আত্মা আমার কাজের আত্মার চেয়ে অনেক মূল্যবান, মহত্ব আর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল।

অনেকেই আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন, অথচ

ضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبادَةِ الثَّقَلَيْنِ

- খন্দকের ময়দানে আলীর (আঃ) সেই তলোয়ার সমস্ত জ্বীন ও ইনসানের ইবাদাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হল কিভাবে?

হযরত আলীর (আঃ) তলোয়ারের এক ঝলকানি এত মূল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু কিভাবে সম্ভব? কেননা, আলী (আঃ) আধ্যাত্মিকতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন আরেফদের ভাষায় যাকে বলে ‘‘ফাইন্নি ফিল্লাহ ’’ বলে অর্থাৎ এবার আমি আল্লাহর হয়ে গেছি।

অর্থাৎ ‘আমি’ বা আমিত্ব’ বলে তার অস্তিত্বে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। চরম উত্তেজনার মুখে পরম শত্রু যখন থুথু নিক্ষেপ করে মুখমণ্ডল ময়লা করে দিলো সে মুহূর্তেও তিনি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে শত্রুর শিরচ্ছেদ স্থগিত রাখেলন। কি জানি, আত্মক্রোধের একটি ফোটাও এ খোদায়ী কাজের মধ্যে ঢুকে তার কাজের আত্মাকে কলূষিত করে দেয় নাকি? আমার অস্তিত্ব হোক কেবল আল্লাহর লীলাভূমি। আর কাজের এই যে মহান আত্মা এ কেবল আম্বিয়া-আউলিয়াগণের কাজেই খুজে পাওয়া যায়- অন্যের কাজে এ আত্মার বিচরণ নেই।

সূরা তওবার ১১২ নং আয়াতে বলা হচ্ছেঃ

(اَلتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

অর্থাৎ, তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, ও সিজদাকারী, সৎকাজের নির্দেশদাতা অসৎ কাজে নিষেধকারী।

মুমিনদের চরি বর্ণনায় কয়েকটি লাইন পরে এসে বলা হচ্ছে। -

اَلتَّائِبُونَ সত্যা প্রত্যাবর্তনকারী লোকেরা। আরেফরা বলেন ‘ লুক’ বা আধ্যাত্মিক পরিক্রমার প্রথম ধাপ হল তওবা। তওবা অর্থ সত্যে প্রত্যাবর্তন। যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, সহসা সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং ফিরে এসে সত্যের পথ ধরে। তওবা করার পরে সে হয় الْعَابِدُونَ আল্লাহর উপাসক। একমা তার ইবাদত করে। সে হয় আল্লাহর বান্দা। গায়রুল্লাহর কোনো অ শাসন সে মেনে চলে না। একমা সেই পরম সত্তার আদেশ পালন করে। الْحَامِدُونَ তারা প্রশংসাকারী। তারা একমা আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তাকে তাদের প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করে না। সমস্ত প্রশংসার একমা অধিকারী মহান আল্লাহ ।

السَّائِحُونَ তারা পরিক্রমণ ও পরিভ্রমণকারী।'সিয়াহাহ' সম্বন্ধে তফসীরে নানান ব্যাখ্যা এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন এখানে সিয়াহা হচ্ছে রোযার মাধ্যমে অর্জিত আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণ। তবে অনেক গবেষক যেমন আল্লামা তাবাতাবাঈ ''আল মিযান'' গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মতে এর অর্থ 'পৃথিবী পরিভ্রমণ'ও হতে পারে। কেননা পবি কোরআন একাধিকবার মা ষকে পৃথিবী ঘুরে দেখতে আহবান জানিয়েছে। পৃথিবী ঘুরে দেখার অর্থ আবার কি? এর অর্থ হল পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করে দেখা। ভবঘুরের পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানোতে কোনো সার্থকতা নেই। অনর্থক ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেবার সময় এ জীবনে নেই। ইসলামের কাছে এ জীবনের গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে । তবে যেখানে মনোযোগ আছে, চিন্তা- গবেষণা আর পর্যবেক্ষণ আছে সে রকম পরিভ্রমণকে ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ 'বলুন পৃথিবী ঘুরে দেখতে।' এ পরিভ্রমণ চিন্তা- ভাবনার আর জ্ঞানের পাঠস্বরূপ।

তাই اَلسَّائِحُونَ হল তারাই যারা ইতিহাসকে পর্যালোচনা করে, ম ষ্য সমাজের সমস্যাবলী বের করে তার সমাধানে এগিয়ে আসে, প্রকৃতিতে বিরাজমান নিয়ম- শৃঙ্খলা যাদের চিন্তার খোরাক, মগজ যাদের মুক্ত ও গতিশীল চিন্তায় পরিপূর্ণ।

এবার নামাযের দুটো রোকনকে উল্লেখ কের বলা হয়েছেঃ

الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ যারা রুকু ও সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর তসবীহ পড়ে, তার মহিমা কীর্তন করে।

আর একমা তারাই হল

الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎ কাজের আদেশদাতা আর অসৎ কাজে বাধা প্রদানকারী। এরকম মানসিকতা অর্জন করে আলোকোজ্জ্বল চিন্তা নিয়ে মহামূল্যবান আধ্যাত্মিক পাথেয় যাদের ঝুলিতে পরিপূর্ণ কেবল তারাই নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে তারাই এবার সমাজের সংস্কার ও সংশোধন কার্যে আত্মনিয়োগ করবেন।

সৎ কাজের উপদেশদাতা এবং অসৎ কাজের বাধা প্রদানকারী অর্থাৎ তিনি সমাজের একজন সংস্কারক, সংশোধক। তাহলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কূপমন্ডুক লোক কি কোনোদিন সংস্কারক হতে পারে? এ জন্যে সবার আগে প্রয়োজন আত্ম - সংশোধন, আপনার সংস্কার।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) বলেছেনঃ

مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ اِمَاماً فَعَلَيْهِ اَنْ يَبْدَأَ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ . وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبِهَا اَحَقُّ بِالْاِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ و مُؤَدِّبِهِمْ

যে নিজেকে জনগণের নেতা বলে পরিচয় দেয়, তাদের পরিচালক ও প্রতিপালক মনে করে এবং তাদের পথ নির্দেশক বলে মনে করে সে যেন সবার অগ্রে আপনার থেকে রু করে। প্রথমে নিজেকেই যেন লালিত ও শিক্ষিত করে নেয়। তার মধ্যে যে নফসে আম্মারাহ বা কুমন্ত্রক আত্মা রয়েছে যা তাকে যেকানো মুহূর্তে বিভ্রান্তির অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করতে পারে, সেটাকেই যেন সর্বাগ্রে সংশোধন করে নেয়। আর যখন কোনো ব্যাক্তি আত্মসংশোধনের এ কঠিন পরীক্ষায় সফলতা নিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারবে কেবল সে- ই দাবী করতে পারবে আমি সমাজে সংস্কার আনতে চাই, সমাজকে সংশোধন করতে চাই। তাই হযরত আলী (আঃ) বলেছেন যে, আত্ম- সংশোধনে নিয়োজিত সে সমাজ সংশোধকদের চেয়ে অধিক সম্মানের পা । কারণ এপথ আরও বেশী সমস্যা সংকুল। (নাহাজুল বালাগা কালিমাতু কেছার- ৭০)

সূরা তওবার উদ্ধৃত এ আয়াতেও শেষে এসে বলা হচ্ছেঃ ''আল আমিরুনা বিল মারুফি ওয়ান নাহুনা আনীল মুনকার'' অর্থাৎ, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী যারা তারাই ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় উচ্ছেদে তারাই সক্রিয় ভূমিকা রাখে। অসত্য আর অ ন্দরের বিরুদ্ধে তারা খড়গহস্ত । তারা সত্য ও দীনের অতন্দ্র প্রহরী।

সবশেষে বলা হচ্ছে - ওয়া বাশশিরিল মুমিনীন- অর্থাৎ যারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, উন্নত আধ্যাত্মের অধিকারী, ও সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর অপার মহিমা ঘোষণাকারী হবার পরে সৎ পথের আদেশ দানকারী আর অসৎ পথের নিষেধকারী হয় তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সফলতা আর বিজয়ের সংবাদ প্রদান করুন।

তাই যদি সব শতাবলী অর্জন করেও কেউ সৎ পথের প্রদর্শক ও অসৎ পথের নিষেধকারী না হয় তবে তারা কিছুই করতে পারবে না। আবার কেউ যদি কালিমা আচ্ছন্ন কলূষিত থেকেও আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার করতে চায় তাদেরও সফলতার কোনো আশা নেই।

আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী (আঃ) বলেছেন :

لَعَنَ اللهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَّارِكِينَ لَهُ، وَ النَاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ

যারা মা ষকে সৎ কাজের আদেশ দেয়, অথচ নিজেরা খেলাপ করে কিংবা অসৎ কাজে বাধা দেয়, কিন্তু নিজেরাই সে কর্মে জড়ায়, তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। (নাহজুল বালাগা, ১২৯ নং খোতবা।)

অর্থাৎ এ সমস্ত আদশ- নিষেধকারীরা اَلتَّائِبُونَ (তওবাকারী) নয়, اَلْعَابِدُونَ (ইবাদাতকারী) নয়, اَلْحَامِدُونَ (প্রশংসাকারী) নয়, اَلسَّائِحُونَ (উন্নত অধ্যাত্মসম্পন্ন) নয়, اَلرَّاكِعُونَ (রুকুকারী) নয়, اَلسَّاجِدُونَ (সিজদাকারী) নয়। যারা এসব পর্যায়কে অতিক্রম না করেই সৎ কাজের আদশদাতা আর অসৎ কাজের নিষেধকারী হতে চায় আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত করুন। আরেফদের মাঝে একটা কথার রেওয়াজ আছে। তারা বলে থাকে যে, স্রষ্টাভিমুখে অভিযা ার পথে সৃষ্টিকে চারটি পৃথক ধাপ অতিক্রম করতে হয়ঃ

(১) سير مِنَ الْخَلْقِ اِلَي الْحَقِّ (সেইর মিনাল খালকি ইলাল হাক্ক)- সৃষ্টিকূল হতে স্রষ্টাভিমুখে অভিযা া।

(২) سير بِالْحَقِّ فِي الْحَقِّ (সেইর বিল হাক্কে ফিল হাক্ক)- স্রষ্টার মধ্যে বিচরণ অর্থাৎ আল্লাহ - পরিচিতি অর্জন।

(৩) سير مِنَ الْحَقِّ اِلَي الْخَلْقِ (সেইর মিনাল হাক্কি ইলাল খালক)- স্রষ্টা হতে সৃষ্টি অভিমুখে অভিযা া; অর্থাৎ মা ষকে তরিয়ে নিতে আসা।

(৪) سير بِالْحَقِ فِي الْخَلْقِ (সেইর বিল হাক্কি ফিল খালক)- এলাহী হয়ে সৃষ্টির মধ্যে বিচরণ।

প্রকৃতপক্ষে তাদের বক্তব্য হল যে, সেই ব্যক্তিই অপরের পথ প্রদর্শক ও সত্য- অসত্যের নির্দেশক হবে যে, ঐ স্রষ্টা- পরিচিতি মহান দরজায় পৌঁছে গেছে এবং অতঃপর সেখান থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টির কাছে ফিরে এসেছে পথ দেখিয়ে তাদেরকেও সেই দরজায় পৌঁছে দিতে। তাই আমাদের আর বোঝার বাকি থাকে না যে, ইমাম হোসাইন (আঃ) ও তার কালজয়ী বিপ্লবের প্রকৃতমূল্য কোথায় নিহিত। তরাং, ইসলামের এই মূল ভিত্তিকে আরও ভালভাবে চেনা প্রয়োজন যে, প্রকৃতপক্ষে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের মর্যাদা ও গুরুত্ব কত বেশী হতে পারে যার জন্যে একজন হোসাইনও (আঃ) সপরিবারে জীবন বিলিয়ে দিলেন।

ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত রাখার একমা গ্যারান্টি হল আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার। এর কোনো বিকল্প নেই। যদি ইসলামে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার না থাকে তাহলে ইসলামও নেই। বিশাল মুসলিম উম্মাহর কোথাও কোনো যান্ত্রিক তথা তান্ত্রিক ত্রুটি দেখামা ই তার প্রতিকার ও মেরামত করা আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের কাজ। একটি কারখানা যেমন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের যত্ন পরিচর্যা ছাড়া নিখুতভাবে চলতে পারে না সেটিকে দীর্ঘক্ষণ চালু রাখা বা তার উন্নতি করা সম্ভব হয় না, তেমনি এক বিশাল সংগঠনও নজরদারি ও পরিচর্যাবিহীন অবস্থায় চালু থাকতে পারে না।

কোন মা ষটি বলতে পারবে যে, আমার ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। মা ষ হয় নিজেই তার চিকিৎসক হবে নতুবা অন্য কেউ তাকে চিকিৎসা করবে। শরীরের অবস্থা জ্ঞাত হবার জন্যে মা ষ প্রতিনিয়ত ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, চোখের জন্যে চক্ষু - বিশেষজ্ঞ, হার্টের জন্যে হার্ট বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। যাতে ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে দেয় তার শরীরের স্থতা- অ স্থতার খবর।

তাহলে মুসলিম উম্মাহর এই বিশাল দেহ কিভাবে বিনা ডাক্তারে স্থ ও সঠিক থাকতে পারে? মুসলিম সমাজের ত্রুটি- বিচ্যুতি শনাক্ত করে তার আ প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকবে না- এটি কি কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কথা?

তাই, ইমাম হোসাইন (আঃ) আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের জন্যে কোরবানি হতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কেননা, তার শাহাদাত ছিল ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য গ্যারান্টি দাতার

শাহাদাত। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামে সেই গুরুত্বের দাবিদার যার শূন্যতায় ইসলাম চলার গতি হারিয়ে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। পরিণতিতে মুসলিম সমাজে- সংঘাত, বিভেদ- বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং কালের বুক থেকে প্রকৃত ইসলামের অবলুপ্তি ঘটবে। পবি কোরআনও এ কথার বাস্তবতা তুলে ধরে একাধিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। অতীত ইতিহাসে বিভিন্ন প্রতাপশালী সমাজ- সভ্যতার বিলুপ্তির কারণ প্রসঙ্গে কোরআন বলছেঃ তাদের মধ্যে সংস্কারক বা সংশোধক শক্তি ছিল না। তাদের মধ্যে কোনো সৎ কাজের আদেশদাতা এবং অসৎ কাজের বাধা প্রদানকারী ছিল না। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার করার মানসিকতা তাদের মধ্যে নির্জীব ও নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল।

তবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে, আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার করার সময় তা মেনে চলতে হয়।

এ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে সর্বাগ্রে ‘মারুফ’ এবং ‘মুনকারের’ প্রকৃত অর্থ জানা দরকার। তাহলে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের মর্মকথা উপলব্ধি করা সহজ হবে।

সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের এ প্রথা ইবাদত, লেনেদন বা আচার- চরিে র মতো কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ইসলামের অভিপ্রায় নয়। বরং জাগতিক সমস্ত কল্যাণকর কাজের বেলায় যেমন আদশ- উপদেশের প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে সার্বিক অর্থে ‘‘মারুফ’’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ যেকানো সৎ ও উত্তম কাজ। এর ঠিক উল্টো দিকে সার্বিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ‘মুনকার’ বা যেকানো মন্দ কাজ ও কুকাজ। এখানেও তাই ব্যভিচার, মিথ্যাচার, পরনিন্দা বা দ- ঘুষের মতো কোনো মন্দ কাজের কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। বরং মারুফের বিপরীতে মুনকার দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে কোন অসৎ ও মন্দ কাজ।

আর ‘আমর’ মানে আদেশ করা এবং ‘নাহী’ মানে নিষেধ করা, বিরত রাখা। এখানে কিন্তু আদেশ- নিষেধ কোনো মৌখিক বাক্য প্রয়োগ কেই ধু বোঝানো হয়নি। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার মৌখিক বাক্য প্রয়োগে যেমন সম্ভব তেমনি মনের অসন্তোষ কিংবা অন্য

কোনো কার্যকরী ব্যবস্থার মাধ্যমেও সম্ভবপর। ব্যক্তির সারা অস্তিত্ব দিয়ে এ কাজ সম্ভব। পবি কোরআনে একশ্রেণীর জীবিত লোককে (মাইয়াতুল আহইয়া) মৃত বলে আখ্যা দেয়ার কারণ সম্বন্ধে হযরত আলীকে (আঃ) প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মা ষ আছে। একশ্রেণীর মা ষ আছে যারা অন্যায় আর অসত্যকে দেখামা ই চমকে ওঠে, তাদের রক্ত উজান বইতে থাকে, সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায়। মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করে, তাদেরকে সত্যের পথ বলে দেয়। তাতেও যদি নিরস্ত্র করতে না পারে তাহলে তারা এবার কার্যকরী কোনো পথ অবলম্বন করে। মোটকথা, কোমলতা, কঠোরতাই হোক আর ঝুকি নিয়েই হোক সে অন্যায়কে প্রতিহত না করা পর্যন্ত শান্ত হয় না। হযরত আলীর (আঃ) ভাষায় এরা হল প্রকৃত অর্থে জীব মা ষ।

আরেক শ্রেণীর মা ষ আছে যারা অন্যায়-অসত্যকে মেনে নিতে পারে না বটে, বরং তাকে প্রতিহত করতে উদ্যোগও নেয় কিন্তু কোনরকম ঝুকি নিতে প্রস্তত নয়। অর্থাৎ ভালোয় ভালোয় যদি কিছু হলো তো ভাল। অন্যথায় তাদের আর করার কিছু নেই। হযরত আলীর (আঃ) ভাষায় এরাও জীবন্ত, তবে পুরোপুরি প্রাণবন্ত নয়। জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে নেই। তৃতীয় আরেক শ্রেণীর লোক আছে দেখলে যারা একটু মনঃক্ষুন্ন হয় মা । কিন্তু এটিকে প্রতিহত করার প্রয়োজন তাদের মনে হয় না। এরা সেই সব লোক কোরআন যাদের সম্পর্কে বলছেঃ

(فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ)

এরা জাহাজে সওয়ার হয়, অতঃপর যখন তুফানের তান্ডবলীলা রু হয় এবং সমুদ্র আছড়ে পড়তে থাকে অমনি পরম নিষ্ঠার সাথে তারা ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তোলে। একমা আল্লাহ ছাড়া অন্যকারও প্রতি তাদের আর মেনাযোগা থাকে না। কিন্তু যেইমা আল্লাহ তাদেরকে পরি াণ দান করলেন এবং নিরাপদে তাদের জাহাজ তীরে এসে ভিড়ল-অমিন আল্লাহকে ভুলতে বসে। ক্রমে আল্লাহর মহত্ত্বকে অস্বীকার করে তার সাথে অংশীদার স্থাপন করতে তাদের আর বাধেনা।

মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্যে ইসলামী নাম নির্বাচন আজকে আমর বিল মারুফের অঙ্গ হয়ে পড়েছে। অনৈসলামী নামের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ হতে হবে। আমাদের সংঘ-সিমিতির

জন্যেও বিজাতীয় নামের বদলে ইসলামী নামে নামকরণ করতে হবে। ইসলামী নামসমূহের পুনঃ প্রচলন ঘটাতে আমাদের সিম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আরবী ভাষার প্রতিও তেমনি আমাদের যত্নবান হতে হবে। এ ভাষা নির্দিষ্ট কোনো গো বা জাতির ভাষা নয়। আরবী ভাষা ইসলামের ভাষা। যদি কোরআন না থাকতো তাহলে আরবী ভাষারও কোনো হদীস থাকতো না। এ ভাষাকে চালু রাখা আমাদের সার্বজনীন দায়িত্ব । কারণ কোনো কৃষ্টি বা সভ্যতা টিকে থাকার পূর্বশত হল তার ভাষার চলন থাকা। যদি কোনো ভাষা টিকে না থাকে তাহলে তার উপর নির্মিত সভ্যতার অচিরেই বিলুপ্তি ঘটবে।

মুসলিম সমাজে বিজাতীয় ভাষার এই দৌরাত্ম আরবী ভাষার প্রতি প্রকাশ্য চ্যালে স্বরূপ। এটি ইসলামের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের ষড়যন্ত্রেরই একটি রূপমা । আরবী বর্ণমালার ওপর কারও আক্রোশ থাকার কথা নয়, কিন্তু যেহেতু আরবী ভাষার পটমূলে ইসলামী সভ্যতা নির্মিত হয়েছে এ কারণে তাদের এই আরবী বিদ্বেষী মনোভাব। তাই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ইংরেজি চর্চা হতে পারে কিন্ত আরবী চর্চাতে বাধা কোথায়? এ ভাষা আয়ত্ব করলে লাভ ছাড়া কোনো ক্ষতি তো নেই। কেননা, প্রথমত বিশ্বে আজ বহুল প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে আরবীও একটি । আর দ্বিতীয়ত আমাদের ধর্ম- দর্শন তথা ধর্মীয় তত্ত্ব - জ্ঞান সব কিছুই আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেগুলো সম্বন্ধে সাম্যক জ্ঞান লাভে আরবী ভাষার প্রয়োজন।

ইংরেজদের চাপিয়ে দেয়া ভাষা আজ আমাদের রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছে, কিন্তু কেন? তাদের সাথে আমাদের কৃষ্টি - সভ্যতার মিল আছে না- কি আমাদেরক কল্যাণ- অকল্যাণ নিয়ে তাদের চিন্তার অন্ত নেই, তাই তাদের ভাষা শিখিয়ে আমাদের দুর্দশার লাঘব করতে চায়? আসলে আমাদের ইসলামী কৃষ্টিকে উচ্ছেদ করে সেখানে তাদের বিজাতীয় চিন্তা- চেতনা ও কৃষ্টি- সভ্যতাকে চাপিয়ে দেবার জন্যেই তাদের এ হীন- প্রচেষ্টা। আমাদের আত্মাকে তুলে সেখানে তাদের আত্মার স্থানান্তর করাই তাদের একমা কাম্য ।

অথচ আমরা কতই না বে- আক্কেল যে তারা তিলে তিলে আমাদেরকে আমাদের ইসলামী আদর্শ থেকে বঞ্চিত করে ফেলছে। অথচ আমরা গভীর ঘুমে নিমগ্ন । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে । অচেতন অঘোর এ মুসলিম সমাজের চেতনা কবে আসবে? সৌভাগ্যক্রমে বলতে হয় যে, মুসলিম জাতি ক্রমে ক্রমে সম্বিত ফিরে পাচ্ছে । দু' দেশের দু'জন মুসলমান ভাই মক্কাভূমিতে সমবেত হলে তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্যে কোনো ভাষা নেই, অথচ আমরা সবাই একই ভাষায় কোরআন পড়ি, একই ভাষায় আল্লাহ - রাসূলের নাম স্মরণ করি, একই ভাষায় নামায আদায় করি। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশের জন্যে কোনো বিজাতীয় ভাষার সাহায্য প্রয়োজন হয় মুসলমানদের এ গ্লানি কি দিয়ে ঢাকা যায়?

এসব কিছুই ইংরেজদের তিন- চারশ' বছরের ষড়যন্ত্রের ফল। তাই, আমাদের আর বসে থাকার অবকাশ নেই।

(أُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

''তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবতার স্বার্থেই তোমাদের এ পৃথিবীতে আগমন। কেননা তোমরা আমর বিল মারুফ এবং নাহী আনিল মুনকার কর।''

আদেশ প্রদানকারী বা বাধা প্রদানকারীর জন্যে দুটো শর্ত রয়েছে। প্রথমত জ্ঞান বুদ্ধির পরিপক্কতা ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিশক্তি । যেনতেনভাবে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের কোন সার্থকতা নেই। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার সম্বন্ধে আমার কতটুকু ধারণা রয়েছে? আর কেমন করেই বা তা কার্যকরী করা সম্ভব? এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে বলেই আমরা এতকাল অন্যের বিকৃত চুলের ষ্টাইল কিংবা জামার বোতাম আর জুতোর ফিতার বিকৃত ষ্টাইলের বিরুদ্ধে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার করে এসেছি। মুনকারকে মারুফ আর মারুফকে মুনকার জ্ঞান করার ঘটনাও বিরল নয়। এসব ক্ষেে আমাদের আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার না করাই শ্রেয়। কেননা এ ধরনের আমর বিল মারুফ করতে গিয়ে কত মুনকারেরই প্রচলন হতে দেখা গেছে। তাই এ কাজে হাত দেবার আগে পর্যাপ্ত- জ্ঞান গবেষণা, পরীক্ষা- নিরীক্ষা, মনস্তত্ব আর সমাজ পরিচিতির মতো অনেক কিছুর প্রয়োজন রয়েছে।

যাতে সর্বোত্তম উপায়ে ও সর্বোচ্চ কার্যকরী পন্থায় ইসলামের এ মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। মারুফ ও মুনকারকে শনাক্ত করতে হবে, এগুলোর মূল উৎস কোথায় খুজে বের করতে হবে। এ কারণে ইমামগণ অজ্ঞ লোকদেরকে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার করতে বারণ করেছেন। কেননা لِاَنَّهُ مَا يُفْسِدُهُ اَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُهُ তারা যত সংস্কার করতে পারে তার চেয়ে বেশী ধ্বংস করে দেয়। তারা ভাল করতে চায় কিন্তু ফলাফলে খারাপ হয়ে যায়। এমন দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি রয়েছে।

এখানে হয়তো অনেকে অজুহাত তুলতে পারেঃ আমরা যেহেতু অজ্ঞ শ্রেণীর লোক তাই এ ব্যাপারে আমাদের আর কোনো করণীয় রইল না। পবি কোরআন স্পষ্ট ভাষায় এর উত্তর দিয়েছেঃ

(لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)

যাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয়এবং জীবিত থাকে এবং সে যেন জীবিত থাকে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে (আনফাল- ৪২)

অথবা,

(لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَي اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ)

‘‘যাতে র ল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মা ষের কোনো অভিযোগ না থাকে।’’ (নিসা- ১৬৫)

ইমামদের (আঃ) একজনকে প্রশ্ন করা হলঃ একদল মা ষ অজ্ঞ । কিয়ামতের দিন এদেরকে কিভাবে বিচার করা হবে? জবাবে বললেনঃ সেদিন একজন আলমকে হাজির করা হবে যে সবকিছু জেনে নেও তা পালন করতো না। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি এসব জেনেও মেনে চলতে না কেন? এবার তার আর কোনো অজুহাত থাকবে না। তখন তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। আরেকজনকে হাজির করে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি কেন পালন করতে না? জবাবে সে বলবেঃ আমি জানতাম না বলে পালন করিনি। প্রত্যুত্তরে বলা হবেঃ

هَلاَّ تَعَلَّمْتَ জানতে না তবে শিখতে তো আর বাধা ছিল না, জেনে নাওনি কেন? জানতাম না, বুঝতাম না এটা কোনো জবাব হল নাকি? বিবেককে আল্লাহ কী কারণে সৃষ্টি করেছেন?

যাতে জ্ঞানার্জন করতে পার, পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করতে পার। এজন্যেই তোমাকে বিবেক দান করা হয়েছে। তোমাকে তেমন জ্ঞানী হতে হবে যারা কেবল চলতি ঘটনাবলীরই আচার- বিচার করে ক্ষান্ত হয় না, অতীত ও ভবিষ্যতও যাদের নখাগ্রে থাকে। হযরত আলী (আঃ) বলেছেন :

وَ لاَ نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّي تَحُلَّ بِنَا - আমাদের জনগণ গণ্ডমূর্খ হয়ে গেছে। কোন বিষয় যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদেরকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে ততক্ষণ তারা বেখবর থাকে। (নাহাজুল বালাগা- ৩২ নং খোতবা) এদের মধ্যে কেউ ভবিষ্যৎ বক্তা নেই। এদের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতার প্রয়োজন। কেবল সমসাময়িক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। সমাজতত্ত্বে এমন দখল থাকতে হবে যে, পঞ্চাশ বছর শত বছর কিংবা হাজার বছর পরের যে বিপর্যয় মানব জাতিকে হুমকি দিচ্ছে তাকেও যেন শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর জ্ঞানের পরিসীমা বর্ণনায় আল্লাহ বলছেন, ‘‘আমরা ইবরাহীমকে পরিপক্ক জ্ঞান দান করেছি।’’ (আম্বিয়া ৫১)। তাই সমাজে সংস্কার আনতে পরিপক্ক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। দুরদর্শিতা বা ভবিষ্যত জ্ঞান ইমাম হোসাইনের (আঃ) বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইমাম হোসাইনের (আঃ) দূরদর্শিতার দৃষ্টিপটে ভবিষ্যত স্বচ্ছ হয়ে ধরা দিয়েছিল। অর্থাৎ তিনি খড়কুটোর মধ্যে ও ভবিষ্যতের যে আভাস প্রত্যক্ষ করতেন, অন্যরা আয়নায়ও তা দেখতে পেত না। আজ আমরা সে যুগের পরিস্থিতির বিচার- বিশ্লেষণ করতে পারি। কিন্তু সেদিনকার মা ষের কাছে ইমাম হোসাইনের (আঃ) কথা- কাজ ছিল দুর্বোধ্য- দুর্গম।

আ রার দিনেও তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা দিলেন, ওরা আমাকে হত্যা করবেই। তবে আমি আজ তোমাদেরকে বলে যাচ্ছি, আমার হত্যার পর ওদের পতন অনিবার্য হবে। অনিতিবিলম্বে তাদের পতন ঘটবে। এদের পতন ছিল আশাতীতভাবে দ্রুত। বনি উমাইয়ারাও বেশী দিন ক্ষমতার মসনদ আকড়ে ধরে রাখতে পারেনি। তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করলো বিন আব্বাসীয়রা। এরপর থেকে দীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বছর ধরে মসনদ থাকলো তাদের আয়ত্তে । মোটকথা, কারবালার হত্যাকাণ্ড থেকে যে বনি উমাইয়ার প্রাসাদে ভাঙন ধরলো, অনিতিবিলম্বেই তা তাদের চরম

পতনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করলো। এ সমস্ত ঘটনা ইমাম হোসাইনের (আঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অসীম ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

কাপুরুষ ইবনে যিয়াদের উসমান নামের এক ভাই ছিল। একিদন উসমান বলল, হে ভাই, যিয়াদের সব সন্তান যদি দারিদ্র, অপমান আর দুঃখের সাথে বেঁচে থাকতো তাতেও আমি অসন্তুষ্ট হতাম না, যত না অসন্তুষ্ট হয়েছি তোমার হাতে আমাদের খান্দানে (কারবালার) এ অপরাধ দেখে। ইবনে যিয়াদের মা ছিল পরকীয়া- ব্যভিচারিণী। সেও একিদন ইবনে যিয়াদকে ভৎসনা করে বললঃ জেনে রেখো তুমি যে অপরাধ করেছ তাতে তোমার বেহেশতের কোনো আশা নেই। এমন কি মারওয়ান ইবনে হাকামের মতো জঘন্য কাপুরুষও ইয়াযিদের দরবারে প্রতিবাদী হয়ে বললোঃ বহানাল্লাহ, মাইয়ার (অর্থাৎ যিয়াদের মার) সন্তানেরা সম্মানিত হোক, কিন্তু নবীর বংশকে এ অবস্থায় তুমি দরবারে আনতে পারলে?

হ্যাঁ, এভাবেই সেদিন ইমাম হোসাইনের (আঃ) ভবিষ্যত বার্তা ফলতে রু করেছিল এবং তা দুশমনের কন্ঠ থেকেও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। স্বয়ং ইয়াযিদের স্ত্রী হিন্দের কথাও হয়তো নে থাকবেন। ইয়াযিদের ক্রিয়াকর্মের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সে ইয়াযিদের কাছে এসবের ব্যাখ্যা দাবি করে। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে সে এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে বসে। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ঘাড়ে সমস্ত দায় চাপিয়ে দিয়ে সে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করে।

ইমাম হোসাইনের (আঃ) সর্বশেষ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অনিতিবিলম্বে ইয়াযিদের পতন হবে। এদিকে কারবালা ঘটনার পর মা দু'তিন বছর চরম দুর্দশা ও হতাশার মাধ্যমে ইয়াযিদী শাসন অব্যাহত থাকে তারপর তার জীবনাবসান ঘটে। পিতার মৃত্যুর পর ইয়াযিদ- পু মুয়াবিয়া চেপে বসলো মসনদে। কিন্তু মা চল্লিশ দিন পার না হতেই একিদন সে ঘোষণা দিল, হে লোকসকল! আমার পিতামহ মুয়াবিয়া আলী ইবনে আবু তালিবের (আঃ)- সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অথচ হক ছিল আলীর (আঃ) সাথে। আবার, আমার পিতা ইয়াযিদ দাঁড়ায় হোসাইন ইবনে আলীর (আঃ) বিরুদ্ধে । এখানেও হোসাইন (আঃ) ছিল সত্যের উপরে, আমার পিতা নয়। আর আমি আমার পিতার ওপর অসন্তুষ্ট । নিজেকেও খেলাফতের যোগ্য বলে মনে করি না। তাই আমার পিতামহ কিংবা

পিতার অপরাধের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর লক্ষে এখানেই আমার পদত্যাগের ঘোষণা দিলাম। সে ক্ষমতা ছেড়ে দিল।

আর এভাবে জয় হল সত্যের। মিথ্যা হল অস্তমিত। ইমাম হোসাইন (আঃ) অসীম আধ্যাত্মিক শক্তিবলে শত্রু- মি উভয়কেই ন্যায়ের পথে উদ্দীপ্ত করে দিলেন। সূচিত হল তরবারির উপর রক্তের বিজয়।

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের বিভি প্রকার ও পর্যায়

মারুফ ও মুনকারের প্রকার ও প্রকৃতি অ যায়ী এর কর্মধারারও কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। তবে সবার আগে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ এবং একইভাবে অন্যায় ও অসত্যের প্রতি আন্তরিক বিকর্ষণ মনোভাব অর্থাৎ সত্যের প্রতি আসক্তি আর অসত্যের প্রতি বিরাগ- এর মূলসূ যেন মা ষের অন্তরে গাঁথা থাকে। তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই যেন উৎসারিত হয় তার এ আকর্ষণ- বিকর্ষণ অ ভূতি।

এখন কোনো অন্যায়কারীকে নাহী আনীল মুনকার করতে হলে প্রথম পর্যায়ে যেটা প্রয়োজন তা হলো ব্যক্তির মধ্যে মানিসক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি অর্থাৎ এখন থেকে তার প্রতি ঔদাসিন্য ও তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করতে হবে। ক্রমেই সে যখন এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে তখন তার মধ্যে মানিসক প্রতিক্রিয়া জন্মাবে। তার প্রতি এ ঔদাসীন্য, তাকে এড়িয়ে চলার কারণ যখন সে ধরতে পারবে তখন সে নিজেই সংশোধনে আগ্রহী হয়ে উঠবে। অবশ্য সব সময় মনে রাখতে হবে যে, নাহী আনীল মুনকার যেন প্রয়োজন ও পরিস্থিতি মোতাবেক ও যুক্তিযুক্ত হয়। প্রদত্ত উদাহরণের কথাই ধরা যাক। এ ক্ষে বিভ্রান্ত ব্যক্তি তখনই সত্য পথে ফিরে আসতে মনস্থ করবে যখন পরিপার্শ্বের সংসর্গের এহেন উদাসীনতা ও এড়িয়ে চলার নীতি তার মনে যন্ত্রণা ধরিয়ে দিতে সক্ষম হবে অর্থাৎ বন্ধুদের এহেন আচরণ তার জন্য একান্ত অসহ্য ও অনভিপ্রেত হবে নতুবা এড়িয়ে চলার এ নীতি অনেক সময় বিভ্রান্ত লোককে আরও বিপথগামী হতে মদদ যোগানোর নামান্তর হতে পারে। যেমন- ধরুন, কোনো পু তার পিতার অজ্ঞাতে কোনো কুকর্মে আসক্ত হয়ে পড়েছে। পিতাকে ফাঁকি দিয়ে সে এ কুকর্ম করেই চলেছে এবং পিতার উপস্থিতিই এখন তার এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিতার নিষেধ যদি না থাকতো তাহলে অবাধে সে এ কাজ করতে পারতো- এমন চিন্তাও তার মাথায় ঘুর পাক খায়। এ পরিস্থিতিতে পিতা যদি তার পু কে অবেহলা করে চলে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে তাহলে তাকে ফিরিয়ে না এনে বরং ফলাফল উল্টো হতে

পারে। কেননা, তার পথের কাঁটা অপসারণ হতে দেখে পিতার আচরণকে সাগ্রহে স্বাগত জানাবে। এক্ষে দেখা গেল যে, এ উদাসীনতা পু র মনে মানিসক যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে ধু ব্যর্থই হল না বরং তাকে আরও বিপথগামী হতে সহায়তা দিল। তরাং এ ক্ষে পরিহার করে চলার নীতি সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য । এ নীতি তখনই প্রযোজ্য যখন তার কার্যকারিতা আশা করা যায় এবং প্রতিপক্ষের জন্যে তা হয় শিক্ষণীয় বিষয়।

তবে পরিহার করে চলার আরেকটা রূপ আছে যাকে ঠিক নাহী আনীল মুনকার বলা যায় না। যেমন দেখা যাচ্ছে দুটো পরিবারের মধ্যকার সম্পর্কে অযথা রকমের দহরম- মহরম। কিন্তু একটি পরিবার বিভ্রান্তির মায়াজালে পড়ে ক্রমেই উচ্ছন্নে যেতে লাগলো। তরাং, এ সর্বনাশা জীবাণু যাতে অপর পরিবারের মধ্যেও সংক্রমিত না হতে পারে সেজন্যে তারা ঐ পরিবারকে পরিহার করে চলবে। এমন ঘটনা অবশ্য ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বিষয়।

নাহী আনীল মুনকারের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে কাজটির কথা আলেমগণ বলে থাকেন তাহলো জিহবার সাহায্যে মা ষকে বাধা দান করা, নিষেধ করা। পরামর্শও উপদেশ সহকারে তার ভ্রান্তি ধরিয়ে দিয়ে তাকে সৎ পথে আহবান করা। বিভ্রান্তির দিকে যারা অগ্রসর হয় তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা নিতান্ত অজ্ঞতাবশত বা কোনো প্ররোচনায় পড়ে এ পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো তাকে কেউ বলে দেয়নি, তার পথ প্রদর্শনের কেউ ছিল না। তার একজন গাইডের অভাব ছিল। তাই এমন লোকদের উ পরিবেশে বৈঠকী মেজাজে আলোচনা- পরামর্শের মাধ্যমে ভ্রান্তি ত্যাগ ও সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করা যায়। নাহী আনীল মুনকারের এটাও আরেকটা পর্যায়। অর্থাৎ আমাদের সাথে যার সংলাপ- সংসর্গ রয়েছে তাকে যদি ভ্রান্তির মধ্যে দেখি যুক্তি - প্রমাণ দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

নাহী আনীল মুনকারের তৃতীয় পর্যায়ে আসে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেবার পালা। বিভ্রান্তির মায়াজাল কখনো কখনো মা ষকে এমনভাবে আষ্টে - পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে সমর্থ হয় না, তেমনি যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা- পরামর্শক্রও তার জন্যে ফল বয়ে আনতে পারে না। এরূপ ক্ষে বিভ্রান্তির করাল গ্রাস থেকে তাকে পরি াণ দিতে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

কার্যকরী ব্যবস্থা বিভিন্ন রূপে হতে পারে। ধু বল প্রয়োগ কিংবা মেরে- ধরে জখম করে দেয়াই কার্যকরী ব্যবস্থা নয়। অব এগুলোরও যে প্রয়োজন নেই এমন কথা বলাও অভিপ্রেত না। বরং বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ব্যবস্থাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইসলামে বে াঘাত বা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছেঃ ইসলামী মতে কোনো কোনো সময় বিভ্রান্তি মুক্তির পথে এধরনের দণ্ডাদেশই একমা কার্যকর উপায়। তাই এ পর্যায়ে সর্বক্ষে ই দণ্ড আর শাস্তির বিধানই একমা কার্যকরী উপায় বললে আমাদের ধারণা হবে নিতান্তই অবাস্তব।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সম্বন্ধে হযরত আলী (আঃ) বলেনঃ

طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ اَحْكَمَ مَراهِمَهُ وَ اَحْمَي مَوَاسِمَهُ.

তিনি চিকিৎসক ছিলেন। তিনি রুগী ও রোগেরও চিকিৎসা করতেন। অতঃপর সাধারণ ডাক্তারদের সাথে তুলনা করে হযরত আলী (আঃ) বলছেন; ডাক্তারদের চিকিৎসা যেমন কখনো কখনো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার তেমনি আবার কখনো কখনো হয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তখন তীব্রযন্ত্রণা সহ্য করেও অস্ত্রপচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তেমনি উভয় প্রকারে আমল করতেন। তিনি (সাঃ) দয়া- কোমলতার আশ্রয় নিতেন। এ কারণে اَحْكَمَ مَراهِمَهُ আগে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ পথভ্রষ্টকে পথের দিশা দিতে তিনি প্রথমে মোলায়েম ব্যাবহার করতেন। কিন্তু, পরিস্থিতি যদি এমন হয়ে দাঁড়াত যে, কোমলতা সেখানে অবান্তর ও মূল্যহীন হয়ে পড়তো তখন কিন্তু তিনি তাদেরকে অব্যাহতি দিতেন না। চরম কাঠিন্যের সাথে তিনি তাদেরকে চিকিৎসা করতেন। কোমলতায় যেমন তিনি ছিলেন অতুলনীয়, কঠোরতায়ও তেমনি ছিলেন আপসহীন, প্রচণ্ড । (নাহজুল বালাগা- ১০৭ নং খোতবা)

উপরোক্ত পর্যায়গুলো সৎকাজের আদেশের ক্ষে ও সমভাবে প্রযোজ্য । পার্থক্য ধু এটুকু যে, আমর বিল মারুফের বেলায় প্রথম পর্যায়টির আর প্রয়োজন হয় না। আমর বিল মারুফ হয় জিহ্বার সাহায্যে নতুবা কার্যকরী ব্যবস্থা মাধ্যমেই করতে হয়। মোটকথা, যারা সত্য ও ন্যায়ের প্রতি গাফেল তাদের বর্তমানে কোন কাজ জরুরি আর কোনটা করা উচিত তা বুঝিয়ে দেয়াই আমর বিল মারুফের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

আমর বিল মারুফের কার্যকরী পন্থাটা হল- মা ষ যেন কেবল বলেই ক্ষান্ত না হয়। ধু বলাটাই যথেষ্ট নয়। আমাদের সমাজের একটা বড় সত্যি হল যে, আমরা মুখের কথা বলতে বেশী যত্নবান। যদিও বক্তার বক্তৃতা, লেখেকর কলম- এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এগুলো না থাকলে হয়তো চলাই দুস্কর হয়ে পড়তো, কিন্তু সবকাজই আমাদের মুখের কথায় সমাধা হয়ে যাক এরূপ প্রত্যাশা নিতান্তই অবান্তর। একটা মন্ত্র পড়ে যে সমাজ পৃথিবীকে আকাশ আর আকাশকে পৃথিবী বানানোর স্বপ্ন দেখে তাকে রুগ্ন সমাজই বলতে হয়। কেবল কথার অস্ত্র দিয়েই ময়দান জয় হয় না প্রয়োজন কিছু কাজেরও। কথা বলাটা প্রয়োজনীয় শর্ত বটে কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। সঙ্গে দরকার কাজের। আমর বিল মারুফের দু'টি পর্যায়ের আবার দু'টি করে ধারা আছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধারা। প্রত্যক্ষ ধারায় আমর বিল মারুফ করতে হলে সরাসরি এসে বলতে হবে, ভাই! একাজটা ভাল কাজ। আমি আপনাকে এ কাজটা করতে আহবান করছি।

কিন্তু পরোক্ষ ধারায়ও আমার বিল মারুফ করা যায়। উপরন্তু, এ পন্থাটাই অধিক কার্যকরী ও ফলপ্রসূ । এ পন্থায় উদ্দীষ্ট ব্যক্তিত্বকে বোঝার অবকাশ না দিয়েই তার কাছ থেকে কোনো বাঞ্ছনীয় কাজের প্রত্যাশা করা বা তার দ্বারা কৃত কোনো সৎকাজের প্রশংসা করা এবং এমন এক লোককে এ ব্যাপারে মধ্যস্থতায় নিতে হবে যার কাছ থেকে উদ্দীষ্ট ব্যক্তি স্বীয় কাজের প্রশংসা নতে পারবে কিম্বা তার করণীয় সম্পর্কে অবহিত হবে। এখানে অপ্রত্যক্ষ পন্থায় আমর বিল মারুফের একটা হাদীসিভিত্তিক দৃষ্টান্ত পেশ করা হলঃ

হাসানাইন (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন) (আঃ) ছোটবেলায় একিদন জৈনক বৃদ্ধের সাক্ষাত পেলেন, সে তখন ওযু করছিল। তার ওযু কিন্তু দ্ধ হচ্ছিল না। দু'ভাই ইসলামী আদব- কায়দার সাথে পুরোপুরি .পরিচিত ছিলেন। তারা দেখলেন একদিকে যেমন এ বৃদ্ধের ভুল ধরিয়ে দেয়া প্রয়োজন। অন্য দিকে আবার তারা যদি সরাসরি গিয়ে বলেন যে, আপনার ওযু দ্ধ হয়নি তাহলে বৃদ্ধের ব্যক্তিত্বের খর্ব হয়, তখন নিশ্চয় সে অসন্তুষ্ট হবে। ফলে, প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই সে নেতিবাচক আচরণ করবে। হয়তো বলে বসবে- না বাবা, আমার ওযু ঠিকই আছে, তোমাদের

আর আমাকে শিখাতে হবে না। কাজেই, এরপর যত যুক্তি - প্রমাণই দাঁড় করানো হবে কোনটাই তার গ্রাহ্য হবে না।

তাই তারা দু'ভাই এগিয়ে গিয়ে বললেন, চাচাজী! আমরা দু'ভাই আপনার সামনে দাড়িয়ে ওযু করবো, আপনি বিচার করে বলে দেবন যে, আমাদের কার ওযু উত্তম হয়। বড়রা সাধারণত ছোটদের এ ধরনের আবদার মেনে নেয়। বৃদ্ধও সেভাবে সম্মতি দিল। বৃদ্ধের সম্মতি পেয়ে ইমাম হাসান (আঃ) প্রথমে সঠিকভাবে ওযু করলেন। অতঃপর ইমাম হোসাইনও (আঃ) একইভাবে ওযু সেরে ফেললেন। এতক্ষণে বৃদ্ধ উপলব্ধি করতে পারলো যে, আসলে তার নিজের ওযুই ছিল অ দ্ধ। তখন বললো, তোমরা উভয়ই উত্তমভাবে ওযু করেছ, আমার ওযুই ছিল অ দ্ধ ।

এভাবে তারা (আঃ) স্বয়ং বৃদ্ধের মুখ থেকে নিজের ভুলের স্বীকারোক্তি আদায় করে নিলেন। অথচ তারা যদি সরাসরি বৃদ্ধকে বলতেনঃ হে চাচা! তোমার লজ্জা করে না? চুল- দাড়ি পাকিয়ে ফেলেছ অথচ দ্ধভাবে ওযু করাটাও এখনও রপ্ত করতে পারনি? তাহলে হয়তো দেখা যেত যে নিজের ভুল স্বীকার তো দুরের কথা নামায- রোযা হয়তো সে ছেড়ে দিয়ে বসতো।

অপ্রত্যক্ষ পন্থায় আমর বিল মারুফকারীকে সৎকর্মী, সত্যাদর্শী, মুমিন ও মুত্তাকী হতে হবে। এ গুণগুলো যার মধ্যে থাকবে সে নিজেই তখন আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের প্রতীক ও নিদর্শন হয়ে দাঁড়াবে। ''আমলের চেয়ে বড় কোনো সোনার কাঠি নেই।'' ভুল করলে দেখা যাবে যে, আম্বিয়া- আউলিয়াকেরামের যতবেশী অ সারী ছিল, কোনো বড় পণ্ডিত বা দার্শনিকের তা নেই। কারণ পণ্ডিত- দার্শনিকরা কেবল যুক্তি - তর্কের মতবাদ প্রচার করেন। তাদের এ আদর্শ নিরস, নিথর। স্বীয় মত তুলে ধরে ঘরের কোণে বসে বই রচনা করাই তাদের কাজ। কিন্তু আম্বিয়া- আউলিয়াকেরাম কেবল আদর্শ নিয়েই আসনে না, সে অ যায়ী যথাযথ আমলও করেন। যা বলেন, সবার আগে নিজে তা পালন করেন। আগে বলে পরে পালন করার নীতিও তাদের চরিে ছিল না। আর যে কথা আগে পালন করে তারপর বলা হয় তার আঁচড় অনেক বেশী ধারালো হয়।

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (আঃ) বলেছেন, (ইতিহাসও যার প্রকাশ্য সাক্ষ্য দেয়):

مَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا وَ قَدْ سَبَقْتُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ، وَ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ اِلَّا وَ قَدْ سَبَقْتُكُمْ بِالنَّهْيِ عَنْهُ

''কখনোই আমি কোনো কাজ নিজে না করা পর্যন্ত তোমাদেরকে তা করতে আদেশ করিনি আর কোনো কাজ থেকে নিজেকে বিরত না রাখা পর্যন্ত তোমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখিনি।'' (নাহাজুল বালাগা, ১৭৫ নং খোতবা)

آكونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَيْرِ اَلْسِنَتِكُمْ

মুখের কথা নয়, বরং তোমাদের আমল দ্বারা মা ষকে সত্যের পথে আহবান করো। (আল-কাফী- ২/৭৮)

মা ষ যদি নিজেই আমল করে ও উত্তম কর্মী হয় তাহলে সবার অজ্ঞাতেই সমাজ তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

সমকালের বিখ্যাত দার্শনিক জনপল সার্টার এ প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় উক্তি করেছেন। যদিও তার এ উক্তি নতুন কিছু নয়। তবে যে শব্দমালায় তার এ উক্তি গাথা হয়েছে তা প্রায় নতুন বলতে হয়। তিনি বলেনঃ ''আমি যদি কোনো কাজ করি তাহলে সমাজের জন্যে ও তাকে পালনীয় ও করণীয় করে দিলাম।'' তার এ উক্তি যথার্থই। ভালমন্দ যে কাজই আমরা করি না কেন, তার ঢেউয়ের দোলা সমাজকে বিদ্ধ করবেই, আমরা তা চাই আর না চাই। সমাজের জন্যে আমাদের এ কাজ এক অঙ্গীকার হয়ে দাঁড়াবে। সমাজের সদস্য হিসেবে কারও কোনো কাজ সে সমাজের প্রতি একটা আহবানস্বরূপ। অর্থাৎ আপনি যখন কোনো কাজ করছেন তখন আপনার এ কাজ দিয়ে সমাজকেও আপনার মতো এ কাজ করতে আহবান জানাচ্ছেন। এটি কার্যকারণের সাধারণ নিয়ম। তখন যদি আপনি গলা চেচিয়েও বলেন যে, ভাই আপনারা এ কাজ করবেন না তবুও আপনার চেঁচামেচি হবে বিফল। কেউ যদি বলে আমি যা বিল তাই করবেন, আর আমি যা করি তার দিকে তাকাবেন না- তাহলে তা হবে নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। কেননা, একজন আমার কথা মেনে চলবে অথচ আমি কি করি না করি তার দিকে দেখবেনা এটা কি কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কথা হতে পারে? তাই অপরের মনে অঙ্গীকার ও দায়িত্ব বোধ জাগানোর মূল চাবিকাঠি হলো কর্ম ও কথা উভয়ই।

পত্যেক সংস্কারকে সর্বাগ্রে নিজেকেই সংশোধন করে নিতে হবে। তবেই সে হতে পারবে সংস্কার মিছিলের অগ্রপথিক। যে সেনাপতি নিরাপদ স্থানে দাড়িয়ে তার সেনাদলকে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আদেশ দেয়, তার সাথে সেনাদলের সামনে থেকে নেতৃত্বদানকারী সেনাপতির আদেশের অনেক তফাত রয়েছে। আম্বিয়া- আউলিয়াকেরামের জীবনে তাই আমরা লক্ষ্য করি যে, তারা সব সময় বলতেন, আমরা যাচ্ছি, তোমরা এস। হযরত আলী (আঃ)ও তাই বলতেন, আমি আগে গেলোম, তোমরা আমাকে অ সরণ কর।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা করতে আদেশ দিতেন যদি তিনি নিজেই সর্বাগ্রে তা পালন না করতেন তাহলে হয়তো অন্যরা তাকে অ সরণই করতো না। তিনি নামায- রোযা করতে বলতেন, সাথে সাথে তিনিই সবেচ' বেশী ইবাদত করতেন।

(وَاِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنِيَ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ)

''তোমার প্রতিপালকই তো জানেন যে, তুমি রা জাগরণ করো কখনো প্রায় রা র দুই-তৃতীয়াংশ।'' (সূরা- মুয্যাম্মিল ২০)

যদি বলতেন আল্লাহর পথে দান- খয়রাতা করো তাহলে তিনিই আগে সব দান করে দিতেন। যদি জিহাদের কথা বলতেন তাহলে সেখানেও তিনি (সাঃ) থাকতেন সবার আগে। যুদ্ধে তিনি (সাঃ) নিকটাত্মীয়দেরকে সামনে পাঠাতেন। এ দেখে স্বাভাবিকভাবে অন্যরাও উদ্যমী হতো। অন্যরা যখন দেখতো যে, আল্লাহর পথে তিনি (সাঃ) প্রাণপ্রিয় আত্মীয়দেরকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন এবং নিজেও সমর সাজে সজ্জিত হয়ে শত্রুর মাঝে নেমে পড়েছেন- তা দেখে তাদের রক্তে উজান বইতো, এক অসীম অ প্রেরণায় তারা উন্মত্ত হয়ে পড়তো। অকাতরে যিনি তলোয়ারের আঘাত সহ্য করেছেন, কপালের রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছেন, মুখের দাঁত ভেঙ্গেছেন তার সমস্ত অস্তিত্বে সত্যের তাজাল্লী দেখে কারও আর সন্দেহের অবকাশ থাকতো। স্বীয় চাচা হযরত হামযা পু তুল্য হযরত আলী (আঃ)- এর চেয়ে রাসূলের (সাঃ) প্রাণপ্রিয় আর কে ছিলেন? অথচ বদেরের যুদ্ধে তিনি তাদেরকেই সামনে দেন।

ইমাম হোসাইন (আঃ) কতটুকু কথা বলেন আর কতটুকু কাজ করেছিলেন, তার বক্তব্যের আয়তন কত সামান্য অথচ তার কর্মের আয়তন কত বিশাল। যেখানে কর্ম আছে সেখানে বেশী কথার প্রয়োজন হয় না। ইমাম হোসাইন (আঃ) নির্দ্বিধায় বলেছিলেনঃ

فَمَنْ كَانَ بَاذِلاً فِينَا مُهْجَتَهُ, مُوَطِّناً عَلَي لِقَاءِ اللهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصبِحاً اِنْ شَاءَ اللهُ

''যে আমাদের এ পথে বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত আছে, অন্তর্যামীর সাথে মিলন যার পরম গন্তব্য একমা সে- ই আমাদের সাথে রওনা হতে পারে।'' (আল লুহুফ- ২৬)

আত্মোৎসর্গ করার প্রস্তুতি নেই আমাদের কাফেলায় তার কোনো স্থান নেই। এ কাফেলা চরম ত্যাগের কাফেলা। নিজ প্রাণকে বাজি রেখে আজ যারা এ কাফেলায় যোগদান করেছে তার মধ্যে ইমামের (আঃ) প্রাণপ্রিয় স্বজন- পরিজনরাও রয়েছে। সেদিন পরিবার- পরিজনদেরকে যদি মদীনায় রেখে আসতেন তাহলে কেউ হয়তো তাদেরকে অনিষ্ট করতে যেত না। কিন্তু তারা যদি সেদিন কারবালায় ইমামের (আঃ) সাথে শাহাদাতের পিয়ালা পান না করতেন তাহলে ইমামের (আঃ) বিপ্লব কি চিরন্তন গতিময়তা লাভ করতে পারতো? কখনই এ বিপ্লবের আহবান চিরকালীন হতো না। ইমাম হোসাইনের (আঃ) পুরো কাজটাই ছিল আল্লাহর পথে উৎসর্গিত হবার এক বাস্তব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । অর্থাৎ এ কাজ কে তিনি একনিষ্ঠতার চরম শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহকে দেয়া যায় এমন কোনো কিছুই আর সেদিন ইমাম হোসাইন (আঃ) অবশিষ্ট রাখেনিন। পরিবার- পরিজনরাও কোনো সাধারণ মা ষ ছিলেন না, যে তাদেরকে জোর করে আনা হবে। তারাও ইমামের (আঃ) একই চিন্তায় চিন্তাশীল, একই ঈমানে বিশ্বাসী এবং একই আদর্শে আদর্শবান ছিলেন। বস্তুত ইমাম হোসাইন (আঃ) কখনও চাননি যে, যার মধ্যে বিন্দুমা দুর্বলতা আছে সে আজ ইমামের (আঃ) সঙ্গী হোক। এ কারণে পথিমধ্যে বারংবার তিনি ঝুকিপূর্ণ এ পথের কষ্টময় পরিণতির কথা ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা তিনি মক্কা থেকে বের হবার আগেই প্রথমবারের মতো উচ্চারণ করেন। কিন্তু হয়তো কেউ কেউ ধারণা করতো, যেভাবে হোক কুফাতে পৌঁছতে পারলে হয়তো ভাগ্য খুলে যেতে পারে। এ যোগ থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় এ অভিলাষ নিয়ে তারা

হয়তো ইমামের সাথে বের হয়েছিলেন। এই একই প্রত্যাশা নিয়ে একদল আরব বেদুইনও ইমামের (আঃ) সাথে পথিমধ্যে যোগদান করে।

এদেরকে সাবধান করে দিয়ে আরেকটি খোতবায় ইমাম (আঃ) বলেন, ''হে লোকসকল! কুফায় গিয়ে আমরা ক্ষমতা লাভ করবো কিংবা কোনো পদে আসীন হবো এ ধরনের প্রত্যাশা যদি কারও থেকে থাকে তাহলে সে যেন ফিরে যায়, তেমন কোন কিছু কি বাস্তবে নেই।''

একথা নে একদল ফিরেও যায়। ছাঁটাই- বাছাই করার শেষ পর্ব অ ষ্ঠিত হয় আ রার রা । তবে ততক্ষণে ইমামের (আঃ) কাফেলায় আর কোনো গলদই অবিশষ্ট ছিল না। কেবলমা 'নাসেখুত তাওয়ারিখ' গ্রন্থের প্রণেতা এক ঐতিহাসিক ভুল করে লিখেছেন যে, আ রার রা ইমামের (আঃ) সেই সতর্কবাণী নে একদল লোক রাতের আঁধারে প্রস্থান করে। কিন্তু, এ বক্তব্য একটি দাবি মা , অপর কোনো ইতিহাসবেত্তা দ্বারা স্বীকৃত নয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আ রার রা ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর কোনো সঙ্গীই তাকে পরিত্যাগ করেননি এবং এদ্বারা তারা প্রমাণ করে দেন যে, আমাদের সমষ্টিতে জ্বরাগ্রস্থ দুর্বলের কোনো চিহ্নই আর নেই।

আ রার দিন যদি ইমাম হোসাইনের (আঃ) একজন সহচর এমন কি একজন শি ও দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে শত্রুবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রাণ বাচাতে উদ্যত হত তাহলে এ ছিল হোসাইনী আদর্শের সবচে' বড় দুর্বলতা, অপূর্ণতা আর অসম্পূর্ণতার প্রতীক। অথচ তিনি দুশমন বাহিনীতে ফাটল ধরালেন এবং নিরাপদ আশ্রয় থেকে শত্রুসেনাকে নিশ্চিত মৃত্যুঘাঁটিতে আকৃষ্ট করলেন অর্থাৎ তারা নিজেরাই আসলো। কিন্তু, একজন লোকও মৃত্যুঘাঁটি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে চাইলো না। ইমাম হোসাইন (আঃ) যদি প্রথম থেকেই যাচাই করে না নিতেন তাহলে ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা ঘটা ধু সময়ের ব্যাপার ছিল। এক সময় হয়তো দেখা যেত অর্ধেক লোক ইমামের (আঃ) খিমা ছেড়ে ইবনে যিয়াদের বাহিনীতে এসে যোগ দিয়েছে। ধু তাই নয়, হয়তো ইমামের (আঃ) বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতেও দ্বিধাবোধ করতো না। কেননা, ইমামকে (আঃ) যে পরিত্যাগ করতো সে তো আর বলতো না যে, আমার ঈমান দুর্বল, আমি ভীতু তাই চলে এসেছি। বরং তার

আসার সপক্ষে যথার্থ কারণ হিসাবে সে যেকানো মিথ্যা প্রচারণায় আশ্রয় নিত হয়তো বলতো, আমরা বহু ভেবে- চিন্তে দেখলাম যে, ইমাম হোসাইন (আঃ) ভ্রান্ত পথে যাচ্ছেন, আর ন্যায় ও সত্য এ পক্ষেই রয়েছে। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইমামকে (আঃ) পরিত্যাগ করে আমরা এ পক্ষকে বেছে নিয়েছি। মোটকথা, তাদের সপক্ষে যেকানো একটি যুক্তি খাড়া করাতো। কিন্তু তেমন কোনো ঘটনার প্রমাণ ইতিহাসে নেই। আর এটি ছিল হোসাইনী (আঃ) আদর্শের আরেকটি চরম গৌরব, পরম বিজয়। নামজাদা একজন সেনাপতিকে তিনি নিজের দলে আকৃষ্ট করেন। হুর ইবনে ইয়াযিদ রিয়াহী সাধারণ কোনো ব্যক্তির নাম ছিল না। তিনি আমীরের পদে প্রার্থিদের একজন ছিলেন। যদি খোজ করা হত যে, ইয়াযিদের এ বিশাল বাহিনীতে উমর সা'দের পরের ব্যক্তিত্ব কে? তাহলে সেখানেও আসতো হুরের নাম। তিনি ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এই হুর ইবনে ইয়াযিদ রিয়াহী এক হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব নিয়ে প্রথমবারের মতো ইমামের (আঃ) গভীর ঈমান, দৃঢ় প্রজ্ঞা আর বাস্তবিক 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারে'র সামনে হুর আর টিকে থাকতে পারেনি। ইমামের (আঃ) বিরুদ্ধে প্রথম যে ব্যক্তি তলোয়ার উচুঁ করেছিলেন তিনিই আজ প্রথমে এসে ইমামের (আঃ) হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। হুর তওবা করলেন। তিনি আত্তায়্যিবুনদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন।

সাহস ও বীরত্বে যার খ্যাতি ছিল দেশজোড়া (তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল যে, ইমাম হোসাইনের (আঃ) গতিরোধ করার জন্য যে একহাজার সৈন্য প্রেরিত হয় তার সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হুরকে) তারই অন্তরাকাশে উদিত হল ইমাম হোসাইনের (আঃ) সত্যনিষ্ট রক্তাভ সূর্য। ভূ- গর্ভস্থ ফুটন্ত লাভা যেমন মাটি চিরে উপরে উঠে আসে তেমনিভাবে হুরের অন্তরে প্রজ্বলিত 'হোসাইনী' নামক ধ্রুবতসত্যের শিখাবানে উদ্ভুত দুর্বার গতি তাকে ইমামের (আঃ) সংস্পের্শে টেনে আনে।'

কিন্তু মা ষ হিসাবে মৃত্যুর আশংকা, স্ত্রী- পুে র বিচ্ছেদ বেদনা তার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় তিনি দুটো পরস্পর বিরোধী দু'মুখী টানের মাঝখানে পড়ে যান। এক সময় দেখা গেল টানের আঘাতে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে রু করেছে। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, সে ভেবেছিল যুদ্ধের ময়দানে যাবার ভয়ে হুরের এই অবস্থা। বললেনঃ না, তুমি বুঝতে পারবে না

আমি কি ধরনের মানিসক দ্বন্দে ভূগছি। আমি নিজেকে বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি । যেটিকে ইচ্ছা সেটিকেই বেছে নিতে পারি। কিন্তু বুঝছি না যে বাকিতে বেহেশতকে বেছে নেব নাকি নগদে এ দুনিয়াকে নির্বাচন করবো যার পরিণতি হবে কঠিন জাহান্নাম।

কিছুক্ষণ ধরে মানবাত্মা ও প বৃত্তির মধ্যে এ লড়াইয়ের মহড়া অব্যাহত থাকলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মহামানব এবং ইমামের ভাষায় এ সিদ্ধ পুরুষ তার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললেন। অন্যরা যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় এ কারণে তিনি সন্তর্পণে দল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। অতঃপর ইমামের (আঃ) তাঁবু অভিমুখে রওনা দিলেন। ইমাম পক্ষ যাতে সন্দেহ না করে এ জন্য তিনি আশ্রয় প্রার্থীর قلب ترسه প্রতীক ওড়ালেন। ইতিহাসের পাতায় আছে তার ঢালকে উল্টে ধরলেন যাতে বোঝে যে যুদ্ধ চায় না, চায় আশ্রয়। প্রথম যার সাক্ষাত হয় তিনি হলেন স্বয়ং আবু আব্দুল্লাহ আল হোসাইন তিনি তখনও তাঁবুর। (আঃ) বাইরে দাড়িয়ে ছিলেন। হুর ইমামকে (আঃ) সালাম দিলেনঃ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ বললেন, হে ইমাম, ‘‘আমি পাপিষ্ট অপরাধী। আমি সেই হতদুর্ভাগা যে সর্ব প্রথম আপনার পথরোধ করেছিল’’। তারপর স্বীয় প্রভূর উদ্দেশ্যে বললেনঃ ‘‘হে আল্লাহ! এ পাপিষ্ঠের পাপ ক্ষমা করে দাও।’’

اللَّهُمَّ اِنِّي اَرْعَبْتُ قُلُوبَ اَوْلِيَائِكَ ‘‘আমি তোমার আউলিয়াগণের হৃদয়কে ভীতসন্ত্রস্ত করে দিয়েছি।’’

ইমামের কাফেলা ইরাক সীমান্তে প্রথমবারের মতো যখন এক হাজার সশস্ত্র ইয়াযিদী বাহিনীর বাধার সম্মুখীন হয় তখন স্বভাবতই তাদের অন্তর শংকিত হয়ে পড়েছিল।

তারপর বললেনঃ হে ইমাম! আমি তওবা করছি। আমি এবার আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। যে কালিমা আমি নিজের হাতেই লেপন করেছি রক্ত ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তা মোছা সম্ভব নয়। আপনার কাছে এসেছি আপনার সকাশে তওবা করব বলে। আপনি বলুন, আমার তওবা গ্রহ্য হবে কি- না? ইমাম হোসাইন (আঃ) হলেন আলীর (আঃ) তনয়। হোসাইন কোনো কিছুই নিজের জন্য চান না। তিনি যদিও জানেন যে, হুর এখন তওবা করুক বা না করুক এ সংকটাবস্থায় মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসবে না, তবুও হুরকে তিনি নিজের জন্য চান না। বরং

আল্লাহর জন্যই চান। তাই হুরের জবাবে তিনি বললেনঃ অবশ্যই তোমার তওবা কবুল হবে। কেউ তওবা করলে তা গৃহীত না হবার তো কোনো কারণ নেই। আল্লাহ কি কোনো তওবাকারীকে তার রহমত থেকে বঞ্চিত করেন? না, কখনই না। তওবা কবুল হয়েছে নে প্রসন্নতায় হুরের দেহমন ভরে গেল। আল্লাহকে তিনি অজস্র ধন্যবাদ জানালেন। এবার ইমামের (আঃ) কাছে অ মতি চাইলেন ময়দানে যাবার। বললেন আল্লাহর পথে আত্ম - বিলানোর তৃপ্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। ইমাম বললেনঃ হে হুর! তুমি আমার মেহমান। নেমে এসো। একটু বিশ্রাম নাও। এসো তোমাকে কিছু আপ্যায়ন করি। (ইমাম যে কী দিয়ে সেদিন হুরকে আপ্যায়ন করতে চেয়েছিলেন তা অজানাই রয়ে গেল)। কিন্তু হুর ইমামের (আঃ) অ মতি নিয়ে নামতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইমামের (আঃ) একাধিকবার অ রোধ সত্ত্বেও হুরের জবাবে কোনো পরিবর্তন এল না। ইতিহাসবেত্তারা হুরের নামতে অস্বীকৃতি জানানোর রহস্য সম্পর্কে বলেনঃ হুরের খুব ইচ্ছা ছিল নেমে এসে ইমামের পাশে একবার বসার। কিন্তু তিনি শংকিত ছিলেন হঠাৎ যদি ইমামের (আঃ) কোনো শি বেরিয়ে এসে তাকে দেখে বলে এই সেই লোক যে সেদিন আমাদের পথ অবরুদ্ধ করে ধরেছিল তাহলে লজ্জায় তার মাথা কাটা যাবে। তাই যত সত্বর সম্ভব তিনি ময়দানে যেতে উদ্যত হন এবং ইমামের কাছে অ মতি প্রর্থনা করেন। ইমাম বললেনঃ এতই যখন তোমার ইচ্ছা তখন আমি আর তোমাকে বাধা দেব না, যাও।

হুর রওনা হয়ে গেলেন। শত্রুদের সম্মুখে এসে তিনি এবার মুখ খুললেন। যেহেতু তিনি নিজেও ছিলেন কুফার বাসিন্দা এ কারণে কুফাবাসীদের কাছে দাওয়াত- প্রসঙ্গকেই টেনে আনলেন। বললেন, যদিও দাওয়াত পাঠিয়ে চিঠি লেখকদের মধ্যে আমি ছিলাম না তবে আমার সামনে অনেককেই দেখেছি যারা ইমামকে (আঃ) আহবান জানিয়ে চিঠি লিখেছে। তাকে তোমাদের ঘরে আসতে আহবান করেছ, সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও তাকে দান করেছ, তাহলে এখন কোন নিয়মমতে, আর কোন দীন বা ধর্মমতে তোমাদের আহুত অতিথির সাথে এহেন আচরণ করে চলেছ?

পরে বুঝা গেল, কোনো একটি ঘটনা হযরত হুরকে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। সেটি হল, এ লোকগুলোর সেই চরম কপট আর নীচ আচরণ যা ইসলাম তথা মানবাত্মার জন্য একেবারেই অশোভন, বেমানান। ইসলামের ইতিহাসে চরম দুশমনের সাথেও এহেন কপটাচরণের কোনো নজীর খুজে পাওয়া যায় না। শত্রুকে চরম করুন অবস্থায় নিপতিত করা কিংবা তার পানি বন্ধ করাকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর (আঃ) বাহিনী মুয়াবিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসাবেও পানি বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানান। স্বয়ং ইমাম হোসাইন (আঃ)ও হুরের বাহিনীকে শত্রু জেনেও তাদের তৃ া নিবারণার্থে পানি দান করেন। নিশ্চয় হুরেরও স্মরণ ছিল যে আজ আমরা যাকে বিনা পানিতে অবরুদ্ধ করে রেখেছি তিনিই সেদিন হাত বাড়িয়ে আমাদেরকে পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করে দিয়েছিলেন। তার মহা ভবতা কোন শীর্ষে আর আমাদের নীচতা কোন অতলে?

তারপর বললেনঃ হে কুফার লোকসকল! তোমাদের লজ্জা হয় না? মাছের পেটের মতো ঝিলিক মারছে এ ফোরাতের পানি। যে পানি সবার জন্য উন্মুক্ত, মা ষ- গরু থেকে বনের প পর্যন্ত যা পান করে পরিতৃপ্ত হচ্ছে, কিভাবে তা তোমাদের নবী- বংশের উপর বন্ধ করে রেখেছ?

অতঃপর তিনি তলোয়ার ধরলেন। শির- দাঁড়ায় প্রাণের স্পন্দন বর্তমান থাকা পর্যন্ত তিনি অকাতরে তলোয়ার চালালেন। ইমাম হোসাইন (আঃ)ও হুরের এ অবদানকে অবমূল্যায়ন করেননি। সপদে দ্রুত চলে গেলেন হুরের শিয়রে। তার প্রশংসায় গজল গাইলেনঃ

وَ نِعْمَ الْحُرُّ حُرُّ بَنِي رِيَاحٍ

''এই হুর কতই না ভাল! তার মা তার জন্য উপযুক্ত নামই নির্বাচন করেছেন।'' আর প্রথম সাক্ষাতে ইমাম বলেছিলেন, হুর স্বাধীনচেতা সিদ্ধপুরুষ। এ পদবি যেকানো লোকের নয়। বরং ইমাম হোসাইন (আঃ) তাকে এ পদবি দান করলেন। এভাবে তিনি প্রতিটি সঙ্গীর বিদায়ক্ষণে তাদের শিয়রে এসে সান্তনাবাণী শোনান। আর এটি ছিল 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারে'র আরেকটি দৃষ্টান্ত ।

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার পালনে আমাদের কর্মপ ।

ইসলামের অন্যতম মূলনীতি ‘‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’’ সম্পর্কে উপস্থাপিত আলোচনা থেকে এবার আমরা কিছু সিদ্ধান্ত বের করে নিতে পারি। প্রথম যেটি উল্লেখ করতে হয় তা হলো আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার কোনো নির্দিষ্ট পরিধিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইসলামের সমস্ত ইতিবাচক লক্ষ্য মারুফের অন্তর্গত আর সমস্ত নেতিবাচক লক্ষ্যাবলী হল মুনকার। যদিও এ নীতিতে ‘আমর’ বা আদেশ এবং ‘নাহী’ বা নিষেধ শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ এসেছে, কিন্তু কোরআন- হাদীস, ইসলামী নীতি- শাস্ত্র এবং ইসলামী ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ইশারায় বোঝা যায় যে, কেবল জিহ্বার ভাষায় আদেশ বা নিষেধ করাই এখানে বোঝানো হয়নি, বরং ইসলামের মহান লক্ষ্যও আদর্শকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় যেকানো বৈধ উপায়ের শরণাপন্ন হবার অ মতি দেয়া হয়েছে। তাই আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের সারকথা যদি ভাষায় প্রকাশ করতে হয় তাহলে বলতে হবে ইসলামী আদর্শকে প্রতিষ্ঠি রাখতে যে কোনো বৈধ পন্থার অবলম্বন করতে হবে। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার সম্পর্কে যে বিষয় সর্বাধিক আলোচনার দাবি রাখে তা হলো ইসলামের এ মূলনীতি পালনে আমাদের কর্মপন্থা এবং আমাদের কর্ম পরিকল্পনা কী? কেননা, ইসলামের এ নীতিই ইসলামের মূল রক্ষাকবচ। এ নীতি ব্যতিরেকে ইসলাম অক্ষুন্ন ও স্বচ্ছন্দ গতিতে টিকে থাকতে পারে না। তাই ইসলাম ও মুসলমানদের মাথা উচু করে টিকে থাকার স্বার্থে এ নীতি পালনে আমাদের কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপন্থা থাকা দরকার। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, এ ব্যাপারে মুসলমানদের কর্মসূচি খুবই হতাশাব্য ক। প্রথমত ইসলাম যত গুরুত্ব দিয়ে এ নীতিকে প্রণয়ন করেছে সে মতো আমরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনি। উপরন্তু আমাদের ধারণায় যত সামান্যই এর গুরুত্বকে উদঘাটন করতে পেরেছি ততটুকুই যথাযথভাবে পালন করার যোগ্যতাও যেমন আমাদের ছিল না, বা বাস্তবায়িতও হয়নি। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

أَلُكُمْ رَاعٍ وَ آكلُّكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

‘‘অর্থাৎ তোমরা মুসলমানগণ প্রত্যেকেই পরস্পরের রক্ষক ও অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অপরের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।’’ (জামিউস সাগীর)

অত্যন্ত চমৎকার রাসূলের (সাঃ)- এই বাণী। অর্থাৎ মুসলিম সমাজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক খোদ মুসলমানদের মধ্যেই যৌথ, পারস্পরিক দায়িত্ব ও অঙ্গীকারবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এত বড় গুরুদায়িত্ব ষ্ঠ ও যথাযথভাবে পালন করতে হলে প্রত্যেককেই যথেষ্ট বুদ্ধি, জ্ঞান ও অবগতি অর্জন করতে হবে। সাথে সাথে যথেষ্ট ক্ষমতা, শক্তিও থাকতে হবে। সম্ভব- অসম্ভবের বিষয় ও লক্ষণীয়। এ কাজে অনেক লোকজনের দরকার। দরকার প্রচুর শক্তিরও। আলহামদুলিল্লাহ! লোকজন কিংবা শক্তি আমাদের পর্যাপ্ত রয়েছে। পৃথিবীতে মুসলিম জনসংখ্যা একশ’ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এগুলোকে সংহত করে একই ধারায় আনতে হবে। এ বিশাল জনগোষ্ঠিকে সংবদ্ধ করে ইসলামী আদর্শ বা বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে, ইসলামী ঐক্য কে দৃঢ় করতে হবে। বিশ্বব্যাপী উন্নত যোগাযোগে মুসলিম দেশসমূহকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে তাহলে অচিরেই মুসলমানরা বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হবে। এমন একটি বিশ্ববলয়কে উপেক্ষা করার দুঃসাহস তখন আর কারও মনে জাগবে না। বিশ্বাগ্রাসী আমেরিকা ও তারই জারজ সন্তান ইসরাইলের পক্ষে তখন আর ঠাট মেরে মুসলিম ভূখণ্ডে বোমা ফেলার ধুর্ত সাহস থাকবে না।

আমাদের বর্তমান দুর্দশার জন্যে আমরাই দায়ী। অগাধ সম্পদের ও শক্তির মালিক হয়েও আজ আমরাই বিশ্বে নিপীড়িত জাতি, দারিদ্র্য, ভুখায় আজ আমরাই মরছি। এসবই আমাদের দ্বন্দ-বিভেদ, বিজাতীয় প্রীতি আর ভণ্ড সাধুদের উস্কানিতে ভাইকে শত্রু ভাবারই পরিণতি।

কিন্তু আমাদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা, পারস্পরিক পরিচিতি বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক দুঃখ- দুর্দশা দূরীভূত করার লক্ষ্যে যে উদ্দোগ নেয়া হয়েছে তা একেবারে হাস্যকর না হলেও অত্যন্ত নগণ্য বলতে হয়। এ বিষয়ে আমাদের বিদ্যমান কর্মদ্যোগকে যদি জানতে চান তাহলে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের পরিসরে আমাদেরকে একবার মেপে দেখুন।

ইসলামের খেদমতের নামে আমরা যে প্রচারমূলক সভা- সংসদের আয়াজন করি সেগুলো কোন মানের আর কোন বিষয়ের একবার খতিয়ে দেখুন। ধর্মীয় বই- পুস্তক ইসলামী সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টি এবং ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞান প্রচারের একটা প্রধান মাধ্যম। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে ধর্মীয় বই- পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে । কিন্তু একবার যাচাই করে দেখুন যে, এগুলোর আধ্যাত্মিক মূল্যমান কতটুকু । আর কতটুকু তারা যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে । বিদ্যমান সমস্যাবলীর কোনটার প্রতি কতটুকু আমাদের সচেতনতা, প্রতিক্রিয়া রয়েছে, এসবই যদি পরীক্ষা করে দেখা হয় তবে আমাদের সামাজিক উন্নতির ধারা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ধারা, সর্বোপরি ইসলামী আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে আমাদের কর্মপন্থা জানতে পারবো।

চৌদ্দ'শ বছর ধরে আমরাই জগতসেরা সভ্যতার কর্ণধার ছিলাম। এর মধ্যে পাঁচ- ছয় বছর ছিল বিশ্ব সভ্যতার শীর্ষে। ''মোহাম্মদ খতামে পেয়াম্বরন'' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে'' ইসলামের কর্মপন্থা'' শীর্ষক কলামে ইসলামী সভ্যতার মৌলিকত্ব এবং এ মৌলিকত্ব যে একমা ও ধু ইসলামেরই অবদান তা প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রমাণ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের প্রথম সারির তিন থেকে পাঁচটি সভ্যতার নাম উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে অবশ্যই ইসলামী সভ্যতার নাম আসবে।

অথচ আমাদেরই এ গৌরব সম্পর্কে আমরা কত ওয়াকিবহাল আছি? আমাদের এ উজ্জ্বল সভ্যতার জ্বলন্ত ইতিহাস তুলে ধরতে আমরা কত প্রচেষ্টা করেছি? আমাদের যুবকরা মনে করে, মুসলমানরা কেবল ইসলামকে মেনেই চেলেছে, কিন্তু ইসলাম মুসলমানদেরকে কিছুই দিতে পারেনি, এমন কি জ্ঞান- বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার ক্ষে ও মুসলমানদের অনবদ্য বিচরণ সম্পর্কেও আমরা খবর রাখি না। যদি জিজ্ঞেস করা হয় গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান কী? তাহলে আমাদের সবাই হয়তো এক রে বলে উঠবে- জানিনে তো! অথচ কত বিজাতীয়ই জ্ঞান- বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান দেখে প্রশংসা না করে থাকতেই পারেনি। অ সন্ধান করে দেখা গেছে যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যে সব মতবাদ বা সূ কে তাদের নিজেদের আবিস্কার বলে প্রচার

করে সেগুলোর এক বিরাট অংশের মুসলমান পণ্ডিতদের হাতেই গোড়াপত্তন হয়েছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন- শিল্প, স্থাপত্য, চারুকলা, দর্শন, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেে ই মুসলমানদের অবাধ বিচরণের কতটুকুর খবরই- বা আমরা রেখেছি? আমাদের অতীত ঐতিহ্য গর্বে আমাদের বুক ভরিয়ে দেয় আজ । অথচ আমরা কি একবার ভেবে দেখেছি যে, আমরা কি ছিলাম আর কি আছি?

শত মূল্য দিয়েও আমাদের এ গাফেলতির খেসারত দেয়া যাবে না। তাই আমাদের অবগতি বৃদ্ধি করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বাড়াতে হবে। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের মূল আবেদনও তাই। মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আর সহমর্মিতা গড়ে তোলা, জ্ঞানের প্রচার, পরস্পরকে চেনা ও জানা, শক্তি সংগ্রহ করা ইত্যাদি। যিনি প্রথম দিন থেকে এ নীতিকে ইসলামী নীতির অবিচ্ছেদ্যও অঙ্গীভূত করে দিয়েছেন তিনি জানেন যে, ইসলাম সমাজ ও সমষ্টির ধর্ম। ব্যক্তি বা স্বাতন্ত্র পরিহার করে মুসলমানরা ঐক্য আর সহা ভূতির সহাবস্থান গড়ে তুলবে। জীবন, সামাজিকতা, ঐক্য, সংঘবদ্ধ সচেতনতা ও সহা ভূতি তার কাম্য । অথচ আমরা- সংঘাতে লিপ্ত, পরের খবর নে দেখার প্রয়োজনও বোধ করি না। আমাদের বিরুদ্ধে যোগ- ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কখনও সচেতন হইনি।

তাই আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার পালন করা আজ অতীব প্রয়োজন। ইসলাম এ নীতির মাধ্যমে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছে। জ্ঞান- বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যাবলীর সমাধান করতে হবে, সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে, সময়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা ঘটনাবলী উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে। নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, অথচ আমরা অনেকেই প্রচলিত ঘটনাবলীরই খবর রাখি না। তেরশ' বছর আগে ইমাম সাদিক (আঃ) বলে গেছেনঃ

اَلْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لاَ تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ

‘‘অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার জামানাকে চিনতে পারবে, বিচার- বিশ্লেষণ দ্বারা কালের স্তরে লুকিয়ে থাকা বিপর্যয়গুলোকে উদ্ধার করে সে মতো নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারবে সে কোনদিন ভুল করবে না।’’ (তুহফাল উকুল, ৩৫৬) অর্থাৎ যারা জামানাকে চেন না, ভবিষ্যতের ঘুরপাক সম্বন্ধে সচেতন থাকে না তারা সর্বক্ষণ ভুল করে, বিপর্যস্ত হয়। আসলকে ছেড়ে নকল নিয়ে তারা মত্ত হয়ে পড়ে, শত্রুকে শিকার না করে বরং নিজেরই বিপদ ডেকে আনে। দুশমনের দুর্গ ভাংচুর না করে নিজেদেরকেই দুর্বল করে দেয়। যেগুলোর প্রমাণ আজ আমাদের চোখে পড়ে অর্থাৎ আমরা ভুল করে যাচ্ছি এবং আমাদের কর্মপন্থাও ভ্রান্তিমুক্ত নয়।

এখানে এসে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের তাৎপর্য মর্মে মর্মে অ ভূত হয়। সাথে সাথে ইমাম হোসাইনের (আঃ) বিপ্লবের প্রকৃত মূল্যও উপলব্ধি করা যায়। তাই আমরাও যদি হোসাইনী (আঃ) হতে চাই এবং হোসাইনী আদর্শের মতো মূল্যমানের অধিকারী হতে চাই তাহলে আমাদেরও পুরাতন জরাজীর্ণতা ছেড়ে নতুন করে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। আর সে কর্মপন্থা কেমন হবে তার নির্দেশনা পবি কোরআন নিজেই আমাদেরকে দিয়েছে-

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মর্যাদাসম্পন্ন জাতি, তোমরা এবার উপরে কিন্তু একটি শর্তসাপেক্ষে- শর্তটি হল।

(تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

যদি আল্লাহ ও রাসূলের কাছে মর্যাদার অধিকারী হতে চাও তাহলে তোমরা ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার’’ কর। যদি বিশ্ব সভায় সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে আসীন হতে চাও তাহলে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার কর।’ তোমরা কি চাও না পূর্ব- পশ্চিম তোমাদের সামনে নত থাকুক, তোমাদের ভাগ্যকাঠি তোমাদের হাতেই আ ক- তাহলে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার কর, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বাড়াও, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধেক দৃঢ় করো, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহগুলোকে একবার খতিয়ে দেখ, দুর্বলতাকে একদম প্রশ্রয় দিও না।

আজ তাই এ অভিযান মিশনে যে আমাদেরকে সর্বাধিক সহায়তা দিতে পারে তা হলো ইসলামের মৌলনীতি ও আদর্শ; হোসাইনী বিপ্লবের মূল চেতনাকে এ পথেই প্রয়োগ করতে হবে। আলী ইবনে আবি তালিব, হোসাইন ইবনে আলীর (আঃ) কর্মপন্থা আমাদের জন্যে অ করণীয়। তারা কিভাবে প্রচারকার্য চালিয়েছেন কিংবা কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করতেন আমরাও সেভাবে এগিয়ে যাব। তারা একটা বিষয় নিয়ে ভাবেন আর আমাদের ভাবনা হবে অন্য কিছুকে ঘিরে এ তো হতে পারে না। আমাদের সজাগা থাকতে হবে যে, ইসলাম প্রচার করে আমরা যে গ্রন্থাদি প্রকাশ করে থাকি কিংবা আল্লাহর পথে যে দান- খয়রাত করে থাকি এগুলো যেন ইসলামের জন্যে কল্যাণকর ছাড়া অকল্যাণকর না হয়ে যায়। কেননা পবি কোরআনেই দান- খয়রাত বা ইনফাকের দু'টি রূপ উল্লিখিত হয়েছে। তার একটি সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ এ জাতীয় ইনফাকের দৃষ্টান্ত হল একটি শস্য বীজের মতো যা একটি উপযুক্ত জমিতে রোপণ করা হয়, তা থেকে সাতটি শীষ বের হয় আর প্রতিটি শীষে জন্মে শতাধিক শস্য দানা।

وَ اللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَّشَاءُ

আল্লাহ চাইলে আরও বৃদ্ধি করে দেন, অর্থাৎ আল্লাহর পথে যা দান করা হয় তা এতই কল্যাণকর ও বরকতময়।

কিন্তু ইনফাকের আরেকটি স্বরূপ আছে যার দৃষ্টান্তও কোরআনে এসেছে। এ ধরনের ইনফাকের দৃষ্টান্ত হল কোনো বিষাক্ত বা বায়ু প্রবাহের ন্যায় যা পাকাপোক্ত কোনো ফসলের ক্ষেতের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় সে ফসলে মড়ক লাগিয়ে দেয় এবং সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয় অর্থাৎ পূর্ণতায় পৌঁছে যাওয়া কোনো জিনিসকেও সমূলে বিনাশ করে দেয়। তাই আমরা যদি নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন ও পরাজয়মুক্ত বিজয় অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদের কর্মপন্থা হতে হবে চিন্তিতও নির্ভুল। আর আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার নামক ইসলামের এ মূলনীতিকে বাদ দিয়ে নির্ভুল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন অসম্ভব।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আজ কোন্ সমস্যা নিয়ে ভাবছেন? আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইহুদীদের গুপ্তামিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আজ কবরে য়েও শংকিত আছেন। ইহুদী সমস্যা যেনতেন কোনো

সমস্যা নয়। আজ যদি এ সম্পর্কে কেউ নীরব থাকে তাহলে সে নির্ঘাত পাপ করলো। প্রত্যেক খতীব, বক্তা, লেখক- কবি সবার আজ বিশ্ব –ইহুদীচক্রের মুখোশ খুলে দেবার বড় দায়িত্ব রয়েছে। ইহুদীবাদী তথা বিশ্বের কুফরী চক্রান্তের ষড়যন্ত্রকে ফাঁস করে দিয়ে মুসলমানদের আত্মসচেতনতামূলক বক্তৃতা, প্রবন্ধ- লেখনী বেশী বেশী প্রচার করতে হবে। ইসলামের দিকটি বাদ দিলেও ফিলিস্তিনের প্রকৃত ইতিহাস কী? ফিলিস্তিন সমস্যা কোনো ছোটখাট বা কারও ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। এ এমন এক জাতির সমস্যা যে জাতিকে বলপ্রয়োগ করে আপন ভিটাবাড়ি থেকে বহিস্কৃত করা হয়েছে। মাতৃভূমি থেকে উৎখাত করে সেখানে গড়া হয়েছে বিজয়ীদের আবাসঘর।

ইহুদীরা দাবী করে যে, তিন হাজার বছর আগে দাউদ ও সোলায়মান নামে তাদের দু'জন শাসক ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের শাসক ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস খুলে দেখুন যে, এই দু'তিন হাজার বছরের মধ্যে কবে ফিলিস্তিন ইহুদীদের হাতে ছিল? আর কোন দিনই- বা ইহুদীরা ফিলিস্তিনের অধিকাংশ - ভূখণ্ডের মালিক ছিল? ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও ফিলিস্তিন ইহুদীদের হাতে ছিল না। খ্রীষ্টানরাই ছিল সেদিন সংখ্যাগিরষ্ঠ ফিলিস্তিনী। মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের হাত থেকেই ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করেছিল এবং ঘটনা ক্রমে খ্রীষ্টানরা ফিলিস্তিন হস্তান্তর করার সময় মুসলমানদেরকে সন্ধি চুক্তিতে একটি শর্তই দিয়েছিল যে, তোমরা ফিলিস্তিনে কোনো ইহুদীকে বাস করতে দিতে পারবে না। আমরা তোমাদের সাথে বাস করতে রাজি আছি কিন্তু ইহুদীদের সাথে নয়।

কিন্তু আজ তিন হাজার বছর পরে এসে বেদুঈনদের মতো বিশ্বের আনাচে- কানাচে ছড়ানো- বিক্ষিপ্ত একদল ইহুদী গায়ের জোরে ফিলিস্তিনে এসে ফিলিস্তিনকে একবারে তাদের ঘাঁটি স্বদেশভূমি বলে দাবী তুলে বসলো, যে কথা নতেও অশোভন লাগে। যে সমস্ত ঘটনা বিংশ শতাব্দীকে কলঙ্কময় করে দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল ইহুদীবাদের অমূলক ও অসঙ্গত দাবী এবং তারই সূ ধরে তাদের এ পাষণ্ডতা যা মানবতার জন্যে অবমাননাকর আর ম ষ্যত্বের জন্যে গ্লানিকর। অথচ বিংশ শতাব্দীকে শান্তির শতাব্দী, মানবাধিকার রক্ষার শতাব্দী, স্বাধীনতা আর ম ষ্যত্বের শতাব্দী বলে চারদিকে প্রচারের ঝড় উঠেছে।

ইহুদীরা মূলত বিভিন্ন অমুসলিম দেশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কোনো সরকারই তাদেরকে বরদা করেনি। রাশিয়া, জার্মান এবং অন্যান্য অমুসলিম সরকার দ্বারা নির্যাতিত হয়ে যারা অতীষ্ট হয়ে উঠল তারা তখন প্রথমবারের মতো নিজেদের জন্যে একটি স্বাধীন আবাস ভূমির চিন্তায় পড়লো। ইহুদী হোতারা প্রচার করে বেড়ালো আমরা যতিদন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকবো ততিদন আমাদের দুর্দশা মুক্তির কোনো আশা নেই। তাই বিশ্ব ইহুদীকে সমবেত করে আমাদের জন্যে একটা নিজ আবাস ভূমি গড়ে তুলতে হবে। তাদের এ আবাস ভূমির জন্যে যে জায়গাটির নাম সর্ব প্রথম প্রস্তাবিত হয়নি তা হল ফিলিস্তিন। তারা বিভিন্ন স্থানের নাম প্রকাশ করলো। এমতাবস্থায় বেঁধে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মি জোট তুরস্কের উসমানী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। উসমানী শাসনের নিন্দা বা প্রশংসা করার কোনো অভিপ্রায় এখানে নেই। যেটাই হোক, সেদিন পর্যন্ত একীভূত মুসলিম সাম্রাজ্যের একটি একক শাসন ও একক শক্তি তো অন্তত ছিল। অত্যাচারী হলেও ঐক্যবদ্ধ মুসলমানদের এক সরকার তো ছিল। আরবীয়দের উপর তুর্কী শাসনকে যেসব আরব প্রীতির চোখে দেখতো না তারা ইউরোপীয় মি জোটের চোখে পড়ল। মি জোট (বৃটেন, ফ্রান্স ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা) তুরস্কের শাসন থেকে মুক্ত করে আরবীয়দের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেবে এ মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে উসমানী শাসনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। বোকা আরবদের সাড়া পেয়ে মি জোট চুড়ান্ত প্রতিশ্রুতি দিল তোমরা যদি উসমানী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার তাহলে আমরা তোমাদের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেব। এখানেও অবিবেচক আরবরা সম্মতি দিল। আর ঠিক যে সময়টি ধরে মুসলমানরা আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত সে অবকাশে ষড়যন্ত্রবাজ ইংরেজ সরকার নব্য প্রতিষ্ঠিত ইহুদী চক্রান্তের সাথে পাকাপাকি করে ফেললো যে, মুসলিম ভূখণ্ডের কেন্দ্রস্থল ফিলিস্তিন হবে ইহুদীদের সেই বহু আকাি ত আবাসস্থল। ইহুদীরাই হবে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের কর্ণধার।

এমন সময় প্রতিষ্ঠা পেল জাতিসংঘ। জাতিসংঘের বিচারটি একবার দেখুন- ঘোষণা দেয়া হল যে, বিশ্বে কিছু কিছু অগ্রসর জাতি রয়েছে, বিশেষ করে উসমানী শাসন থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত জাতিগুলোর জন্যে আমরা ''অভিভাবক কমিটি'' মনোনীত করবো যারা এদেরকে পরিচালনা

করবে অর্থাৎ মূলার্থে তারা উসমানী শাসনের উত্তরোত্তর সম্পদকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেবার ফন্দী করলো। এর একাংশ নিল ইংরেজরা, আরেক অংশ পেল ফ্রান্স ....। ইংরেজরা যেসব এলাকার কর্তৃত্ব পায় তার মধ্যে ফিলিস্তিনও।

ব্রিটেন বললো আমি তোমাদের বৈধ অভিভাবক। কিন্তু চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়ে 'বেলফোর্ড চুক্তি'র মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড হস্তান্তরের চুড়ান্ত দলিল তৈরী করে ফেলল।

বিশ্ব ইহুদীবাদ হল বিভিন্ন বংশোদ্ভুত এবং বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দা ইহুদী স দায়। আমি (ওস্তাদ মোতাহহারী) নিজেও এতদিন মনে করতাম যে, বর্তমানে পৃথিবীতে যে ইহুদী স দায়ের লোকগুলো আছে এরা সবাই ইসরাইল বংশোদ্ভুত। অথচ এখন দেখি এমন কি ইতিহাসও এ ব্যাপারে সন্দিহান। অনেক ইহুদীই এখন আছে ইসরাইল বংশের সাথে যাদের কোনো সম্পর্কই নেই। তারা কেবল একই স দায়ভূক্ত । ইসরাইলীরা তাদের বংশধারা অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি। পৃথিবীর আনাচে- কানাচের নিপীড়িত ও নির্যাতিত ইহুদীরাই আজ ফিলিস্তিনীদেরকে বিতাড়িত করে সেখানে নিজেদের আবাস গড়ার স্বপ্ন দেখছে। বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম থেকেই ইহুদীদের দুনিয়াজোড়া খ্যাতি ছিল। উপরন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থেই নাকি অ মতি আছে তোমাদের মানোবাঞ্ছা পূরণ করতে প্রয়োজনীয় যে কোনো পন্থা অবলম্বনে কার্পণ্য করবে না, আর যেখানেই যাও কখনও দয়ামায়ার প্রশ্রয় দেবে না।

অতঃপর যখন ইংরেজদের যোগসাজশে সব ব্যবস্থা তৈরী হয়ে গেল, অমিন পাগলের মতো সারা দুনিয়ার ইহুদীরা ফিলিস্তিন অভিমুখী হল। তারা চড়া দাম দিয়েও ফিলিস্তিনী জমি কিনতে লাগলো। ক্রমেই তাদের উদ্ধত আচরণে ফিলিস্তিনীরা শংকিত হয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনে পাঁচ হাজারের মতো বনেদী ইহুদী ছিল। এমন কি নবাগত ইহুদীরা তাদের প্রতি করুণাও করলো না। বনেদী ইহুদীদের জন্য তারা হয়ে দাঁড়াল কাঁধের বোঝা স্বরূপ। এতদিনে এক শ্রেণীর আরব চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী অসন্তোষ প্রকাশ করে বিরোধিতায় নামে। কিন্তু অভিভাবক গোষ্ঠীর হাতে তখনই তাদের প্রাণ নাশ করা হয়, ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুলানো হয়।

এদিকে অবিরামভাবে ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে স্থানান্তরের কাজ চললো। তারপর যখন ইহুদীদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন বিশ্বাসঘাতক ইংরেজরা তাদের মধ্যে বিতরণ করল রাশি রাশি অস্ত্র । অস্ত্র হাতে পেয়ে এবার ইহুদীরা প্রকাশ্যে এবং নিজ হাতেই বনেদী মুসলমানদের উৎখাত অভিযান চালু করে দিল। আর ওদিকে দলে দলে ইহুদী এসে দখল করতে লাগলো বহিস্কৃত ফিলিস্তিনীদের বাড়ীঘর। আজ যেসব ইহুদী হর্তাকর্তার নাম নতে পান- আইজ্যাক রিবন, আইজ্যাক শিমর, যেলি আশকুল, গোলডামায়ের ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার অ সন্ধান করে দেখুন তো এরা কবে ফিলিস্তিনের লোক ছিল? অথচ এরাই আজ ‘‘ফিলিস্তিন আমার’’, ‘‘ফিলিস্তিন আমার’’ চীৎকারে দিগন্ত প্রকম্পিত করে দিচ্ছে । কিন্তু, ি শ লাখ প্রকৃত ফিলিস্তিনী যে আজ উদ্বাস্তু শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করে যাচ্ছে তা নিয়ে বিশ্ব সমাজের কোনো মাথা ব্যথা নেই।

ভুল আমরা সবাই করেছি এবং এ ভূল খুব মারাত্মক ভুল। এর মা ল আমাদেরকেই দিতে হবে । একটি ইহুদী রাষ্ট গঠন করাই ইহুদীদের আসল অভিসন্ধি । আর তারা এটাও ভালভাবে জানে যে, একটি ক্ষুদ্র ইহুদী রাষ্ট এখানে টিকতে পারবে না। তাই যত দ্রুত সম্ভব বৃহত্তর ইসরাইল গড়তে হবে। আর সে উদ্দেশ্যই তারা ‘‘নীল থেকে ফোরাত’’ পরিকল্পনাও তৈরি করে রেখেছে। ওরা কি তাদের এ স সারণবাদী কার্যকলাপ করে যাচ্ছে না? মদীনার অদূরে খায়বার - ভূখণ্ডের দাবী কি তারা তোলেনি? রুজভেল্ট কি তৎকালীন সৌদি সরকারকে এ ভুখণ্ডটি ইহুদীদের কাছে বিক্রি করে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেনি। ওরা কি ইরাক সমেত আমাদের অন্যান্য তীর্থ স্থানের দাবী তোলেনি?

তাই সম্রাজ্যবাদী এ ইহুদীদের রুখতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা জবাবদিহির কাঠগড়ায় আমাদের বলার কিছু থাকবে না। মুসলিম সরকারগুলোর এ ব্যাপারে নি য়তা অব্যাহত থাকলে পরে খুব দেরী হয়ে যাবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, এ বিষয়টিই আজ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বিদেহী আত্মাকে বেশী কষ্ট দিচ্ছে । এ কারণেই আজ ইমাম হোসাইনের (আঃ) পবি আত্মা বিদীর্ণ।

আজও মহররমের চাঁদ এলে আমরা ইমাম হোসাইনের (আঃ) স্মরণে আযাদারী করি। এ 'আযাদারী' ইমামের (আঃ) বিপ্লবী চেতনার জন্য হানিকর। এ আযাদারীর প্রকৃত তাৎপর্য কোথায় তা আজ আমাদের খুজে বের করতে হবে। আর এ তাৎপর্যকে আমরা তখনই উপলব্ধি করতে পারবো যখন বুঝতে পারবো যে, আজ যদি ইমাম হোসাইন (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে তার স্লোগান কি হত? কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি আজ বিশ্বকে প্রকম্পিত করে দিতেন? সেদিন যেমন কোনো অপমান ও নীচতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি আজও নিঃসন্দেহে তিনি কোনো অন্যায়ের কাছে মাথাবনত করতেন না।

তাই তিনি থাকলে আজকে অবশ্যই তার স্লোগান হত ফিলিস্তিনকে নিয়ে। আজকের শিমার হল আইজ্যাক রিবন। সেদিনের শিমার তের শ' বছর আগেই জাহান্নামে গেছে। আজকের শিমারকে সনাক্ত করতে হবে। মুসলিম পথ- প্রন্তর আজ ফিলিস্তিন স্লোগানে প্রকম্পিত হওয়া উচিত। এক মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে আমাদের কানে ফুঁকে দেয়া হয়েছে ফিলিস্তিন সমস্যা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এটি আরব ও ইসরাইলের নিজস্ব ব্যাপার। তাহলে প্রশ্ন হল, এটি যদি দীন- সংক্রান্ত ব্যাপার না হয় এবং স্রেফ একটি রাজনৈতিক ব্যাপার হয় তাহলে বহির্বিশ্বের ইহুদীরাই কেন ধুমা ইসরাইলেক মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে ? সেদিনের প - পি কায় অনবরত রিপোর্ট আসত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ইহুদীরা ফ্যান্টম জঙ্গীবিমান, ওমুক মারণাস্ত্র কেনার জন্য ইসরাইলে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পাঠাচ্ছে । যাতে তারা অনায়াসে মুসলিম নিধন কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করতে পারে। একসময় পি কায় আসলো যে আমিরকার ইহুদীরা প্রতিদিন ২১ লাখ ডলার ইসরাইলকে দেয়।

অথচ আমরা মুসলমানরা ফিলিস্তিনী ভাইদের জন্যে কি করি? আমাদের মুসলমান বলে দাবী করতে লজ্জা পাওয়া উচিত, ইমাম হোসাইনের (আঃ) অ সারী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করা উচিত। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে তারা সেদিন জানমাল দিয়ে লড়াই করেছেন। আর আমাদের কি কোনো কর্তব্য নেই? ফিলিস্তিনীদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে আমাদের কি কোনো করণীয় নেই? তারা কি মুসলমান নয়, তাদেরও কি স্বজন- পরিজন নেই ? কেউ কি বলতে

পারবে যে, ঘর- সংসার হারা বিতাড়িত ফিলিস্তিনীরা তাদের ভিটাবাড়ীতে ফিরে যাবার অধিকার রাখে না। যে ফিলিস্তিনী যুবক বুক ফুলিয়ে বলতে পারে دِمَاءُ الشُّهَدَاءِ শহীদানের রক্তই এখন আমাদের একমা আশা, যাদের কাপড় কেনার পয়সা নেই, নাঙ্গা পায়ে জিহাদ করে যাচ্ছে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো কি আমাদের উচিত নয়? যদি বিশ্বের একশ' কোটির বেশি মুসলমান প্রতিদিন এক পয়সা করে ফিলিস্তিনীদের দান করে তাহলে বৎসরে কোটি কোটি টাকা হয়ে যায়। যদি এক- দশমাংশ মুসলমানও এক পয়সা করে ফিলিস্তিনীদেরকে সাহায্য করতো তাহলে অনেক কিছুই হয়ে যেত।

(فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ.)
''আল্লাহ সেই মুজাহিদদেরকে মর্যাদাশীল করেছেন যারা ঈমান এনেছ এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে।'' (নিসা- ৯৫, তওবা- ২০) আমরা অর্থ দিয়ে তো অন্তত সাহায্য করতে পারি। অবশ্যই এই ইনফাক ও অর্থ সাহায্য করতে পারি। অবশ্যই এই ইনফাক ও অর্থ সাহায্য নামায রোযার মতোই আজ আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। মৃত্যুর পর প্রথম যে প্রশ্নের জবাবদিহি আমাদের করতে হবে তা হলো মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে তুমি কি করেছ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ''যদি কোনো মুসলমান সাহায্যের আহবান জানিয়ে ফরিয়াদ তোলে এবং তার এ আবেদন শোনার পরও কেউ তার সাহায্যার্থে এগিয়ে না আসে তাহলে সে মুসলমান নয়। আমি তাকে মুসলমান বলে গণ্য করি না।''

ফিলিস্তিনীদের জন্যে একাটি াণ- তহবিল খুলতে বাধা কোথায়? আমাদের দৈনিক আয়র একটি সামান্য অংশও কি নিপীড়িত বঞ্চিত ফিলিস্তিনীদের জন্যে দান করতে পারি না? বিশ্ব - ইহুদী স দায় লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে ইসরাইলকে তার নরপিশাচ- পাশবিক নীতির মদদ যুগিয়ে যাবে আর সাথে সাথে বিশ্বের সংহত ও সচেতন জাতি বলে নাম কুড়াবে; সেখানে আমরা কি আমাদের বঞ্চিত- নিগৃহীত মজলুম ভাইদের আত্মরক্ষার্থেও কিছু করবো না? সচেতন জাতি তারাই যারা সময় ও যোগ বোঝে, বাস্তবতাকে চেনে আর অপরের খ- দুঃখ অ ভব করতে পারে।

তাই এখন থেকে আমাদের চিন্তা- কর্ম, শক্তি, বই- পুস্তক এবং অর্থ সম্পদের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হবে। তবেই বিশ্ব সভায় আমাদের আসন মর্যাদাসম্পন্ন ও অলংকৃত হবে। আজ যে বিশ্বের বৃহৎ শক্তি বর্গ আমাদেরকে গুণতিতেই আনে না তার কারণ হলো আমাদের মধ্যে কোনো অঙ্গীকারবোধ বা অহংকার বোধ নেই। এই একটি দুর্বলতাই মুসলমানদেরকে নিয়ে আমেরিকার রঙিন স্বপ্নের খোরাক যুগিয়েছে। তারাও ঠিক সনাক্ত করেছে যে মুসলমানদের মধ্যে না আছে সংহতি ও সহা ভূতি আর না আছে কোনো অঙ্গীকারবোধ ও অহংকারবোধ। তারাই বলে যে ইহুদীরা অর্থ ছাড়া আর কিছুই চেনে না। অর্থই তাদের দেবতা, অর্থের জন্যেই তাদের জীবন-মরণ। অথচ জাতির কোনো জরুরী কাজে তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার নির্দ্বিধায় দান করতে পারে। কিন্তু ঐ একই অবস্থায় বিশ্বের একশ' কোটি মুসলমান সামান্য কিছু করতেও রাজী হবে না।

তাই ইমাম হোসাইনের (আঃ) আদর্শ থেকে শিক্ষা নেবার প্রয়োজনীয়তা আজ মুসলমানদের মর্মে মর্মে অ ভূত হচ্ছে । ইমাম হোসাইনের (আঃ) সেই আপোষহীন দুর্বার চেতনা, অসীম বিচক্ষণতা, দুর্জয় সাহস আর দৃঢ় অঙ্গীকার অবশ্যই আমাদের জন্যে অ করণীয় আদর্শ। আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ নামক জনৈক লেখক ইমাম হোসাইনের (আঃ) প্রশংসায় বলেনঃ আ রার দিন ইমাম হোসাইনের (আঃ) অসংখ্য মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে যেন প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। তার ধৈর্য যেন তার অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে আগে উঠতে চায়। তার একনিষ্ঠতা যেন চায় অন্য গুণগুলোতে হার মানিয়ে দিতে। তদ্রুপ হোসাইনের (আঃ) অসীম সাহস যেন আর গুলোকে পিছে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে। মোটকথা প্রত্যেকটি গুণই সেদিন যেন বাকীগুলোকে ছাড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওস্তাদ মোতাহহারী বলছেন, তবে ইমাম হোসাইনের (আঃ) সম্পর্কে কিছু বলতে আমি অতি নগণ্য । তা হল যে, সেদিন ইমামের (আঃ) যে গুণটি অন্যান্যদেরকে ছাড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা ছিল তার অবিচল আস্থা, দৃঢ় প্রত্যয় আর গভীর নিশ্চয়তা। একথাটা আমাদের মুখ থেকেই প্রথম বের হয়নি। সেই প্রথম দিনগুলোতেই এ সত্য উপলব্ধি করা গিয়েছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি বলেছিলঃ

وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مَكْثُوراً قَطُّ قُتِلَ وَ لَدُهُ وَ اَهْلُ بَيْتِهِ وَ اَصْحَابُهُ اَرْبَطَ جَأْشاً مِنْهُ

সেদিনের সেই কাল- পা ও বুঝ ক্ষমতার প্রেক্ষিতে নিশ্চয় এ উক্তি ছিল কালজয়ী উক্তি । প্রকৃতপক্ষে উক্তিকারী ছিল একজন সরকারী সাংবাদিক। সে বলছেঃ ‘‘চরম দুর্দশাগ্রস্থ একজন ব্যক্তি যার চোখের সামনে জন- পরিজনের অসংখ্য মস্তকবিহীন লাশ ছড়িয়ে আছে, কষ্ট আর ক্লান্তিতে যার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তারপরও সে এত অবিচল আস্থাবান আর দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হবে।’’ (লুহুফ, ৫০)

আরও একটি ঘটনা সেদিন সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। এটি কোনো সামান্য ঘটনা নয়। আমাদের বিস্মিত হতে হয় যে, সব স্থান থেকে নিরাশ হয়ে শেষ মুহুর্তে এবার যখন ইমাম হোসাইন (আঃ) নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যে এগিয়ে চলেছেন সে মুহুর্তেও এত দৃঢ়তা, এত অটলতা তার চেহারায় উদ্ভাসিত ছিল! তিনি এত দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ করছিলেন যে, তার এ বিপ্লবের উজ্জ্বল ভবিষ্যত যেন তার চোখের সামনে ভাসছে। আর এক শহীদানের বদলেই তিনি যে চুড়ান্ত বিজয় হাতে পাবেন তা ছিল তার সন্দেহাতীত। তিনি নিশ্চিত ছিলেন আজ আ রার দিনে সবটুকুই কাজে খাটাতে হবে অর্থাৎ আজ হলো চাষের শেষ পর্ব, আর আজ আরও একটু পর থেকেই রু হবে এ বিপ্লবের ফসল ঘরে তোলার পালা।

সূচীপ

হোসাইনী আন্দোলন মহান ও বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন. ৭

হোসাইনী আন্দোলন মুসলিম সমাজের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আন্দোলন. ২৪

ইমাম হোসাইন (আঃ)- এর উপর সর্বশেষ অবিচার. ৩৭

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের পূর্ব- শর্তাবলী. ৫৩

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকারের বিভিন্ন প্রকার ও পর্যায় ৬৯

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনীল মুনকার পালনে আমাদের কর্মপন্থা ৮২